গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৫ - ১১ ডিসেম্বর, ২০০৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

মুম্বই হামলার পরিকল্পনাকারীদের চিহ্নিত করতে হবে

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি

২৬ নভেম্বর মুম্বইয়ে, হাসপাতাল, জনবহুল রাস্তা সহ ৭টি বিশেষ স্থানে দেড় শতাধিক মানুষের মৃত্যু ও হাজারেরও বেশি মানুষের আহত হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ২৭ নভেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, যেকোনও উদ্দেশ্যেই হোক, যারাই এভাবে নৃশংস হামলা চালিয়ে নির্দোষ, নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটাল, তাদের মনে রাখা উচিত যে, এর পরিণাম মারাত্মক ও তা ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য। তিনি আরও বলেন, সংশ্লিষ্ট সকলেরই বোঝা উচিত যে, কোনও ন্যায্য স্বার্থ তুলে ধরার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয় যদি পথ সঠিক ও উপযুক্ত না হয়। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে উন্মত্ত আক্রমণ চালানো ও তাদের হত্যা করা কখনই সঠিক পথ নয়।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করে কমরেড মুখার্জী বলেন, ভারতের বাণিজ্য রাজধানীর বুকের উপর দফায় দফায় এই ধরনের নির্বিচার হত্যাকাণ্ড দেখিয়ে দেয় যে, সাধারণ নাগরিকদের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় সরকারগুলি নিতান্তই উদাসীন ও দায়িত্বহীন। অথচ এই সরকারগুলিই আবার গর্ব করে বলে, দেশের গোয়েন্দাব্যবস্থা নাকি অত্যন্ত সুসংগঠিত, পুলিশ ও মিলিটারিও নাকি যেকোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় সদাপ্রস্তুত। তিনি আরও বলেন, এই ধরনের ব্যাপক আক্রমণ, যা অত্যন্ত সংগঠিত কোনও গোষ্ঠীর কাজ — সে সম্পর্কে সরকারের কাছে কোনও আগাম সূত্র না থাকা সত্ত্বেও এখন হঠাৎ সরকার বলছে, সমুদ্রপথে শত শত সন্দেহভাজন লোক নাকি দেশে ঢুকে পড়েছে। পরপর বিস্ফোরণ ও কাপুরুষোচিত আক্রমণে দেশের মানুষ যখন রাস্তায় কুকুর-বেড়ালের মতো মারা যাচ্ছে, তখন সরকারি কর্তাদের এধরনের কথাবার্তা নিজেদের নিষ্ক্রিয়তা ও জনগণের প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা পালনে শোচনীয় ব্যর্থতাকে আড়াল করার মিথ্যা অজুহাত ছাড়া কিছু নয়।

এ ধরনের বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড ও হিংসাত্মক ঘটনা বন্ধ করতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার, এই ঘৃণ্য অপরাধের জন্য যারা দায়ী, গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশ-মিলিটারিকে ব্যবহার করে তাদের চিহ্নিত করা, গ্রেপ্তার করা ও জনগণের সামনে হাজির করার এবং সম্পূর্ণ অসহায় ও নিরাপত্তাহীন জনগণের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য এখনই তৎপর হতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন কমরেড নীহার মুখার্জী। এই কাপুরুষোচিত আক্রমণে নিহতদের পরিবারের ও গুরুতর আহতদের প্রতি আন্তরিক শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে কমরেড মুখার্জী সমস্ত ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ও আহতদের বিনামূল্যে যথার্থ চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কাছে দাবি করেছেন।

লালগড় সহ জঙ্গলমহলের নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের পাশে দাঁড়ান

সম্প্রতি শালবনিতে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণকে অজুহাত করে কোনও প্রমাণ ছাড়াই বিস্তীর্ণ এলাকার নিরীহ শিশু-নারী-বৃদ্ধ নির্বিশেষে ব্যাপক মানুষের উপর পুলিশের নৃশংস ও উন্মত্ত সন্ত্রাসের জন্যই শুধু জঙ্গলমহলের (আদিবাসী সহ সব ধর্ম ও উপজাতির) সমস্ত মানুষের এমন সর্বাত্মক বিদ্রোহের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেনি। বাস্তবে বহুকাল থেকেই আদিবাসী মানুষের উপর তথাকথিত সভ্য চতুর বিত্তবান মানুষদের চাপানো শোষণ-নিপীড়ন-বঞ্চনার মর্মন্তুদ ঘটনা লাগামছাড়া রূপ নেয় ব্রিটিশ আমলে। তার বিরুদ্ধে সিধু-কানহু-বিরসাদের নেতৃত্বে আদিবাসীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম বিদ্রোহের রূপে ব্রিটিশের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়, যখন তথাকথিত 'ভদ্র' মানুষজন ব্রিটিশ-ভজনায় লিপ্ত ছিল। বর্বর ব্রিটিশ শাসকেরা হাজার হাজার আদিবাসীকে হত্যার মধ্য দিয়ে সেই বিদ্রোহকে দমন করলেও সরল আদিবাসী মানুষজন আজও সেই বিদ্রোহের গৌরবজনক স্মৃতিকে আত্মমর্যাদাবোধের রূপে নিজেদের বুকে বহন করে চলেন। দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রে - রাজ্যে কংগ্রেস শাসনকাল থেকেই (এবং কিছু সময় কেন্দ্রের বিজেপি শাসনেও) আদিবাসী সহ জঙ্গলমহলে বসবাসকারী সমস্ত ধর্মবর্ণের মানুষের উপর সেই নিপীড়নের অবসান তো হয়ইনি, বরং নতুন নতুন ছলনার পথে অনুন্নত এলাকা উন্নয়নের নামে বা আদিবাসী উপজাতিদের কল্যাণের নামে গুটিকয়েক তাঁবেদার স্বার্থান্বেষী আদিবাসী নেতাকে ক্ষমতাসীন নেতাদের মতোই ধান্ধাবাজ সুযোগসন্ধানীতে পরিণত করে, বাকি বিপুল সংখ্যক মানুষকে চরম দারিদ্র-অশিক্ষা-কর্মহীনতার অন্ধকারেই ফেলে রাখা হয়েছে। একই পদ্ধতি বিগত ৩২ বছরে এ রাজ্যে সিপিএম গোষ্ঠীভুক্তদের শাসনক্ষমতা লাভের সময় থেকে চলছে এবং বহুগুণে বেড়েছে। তখন থেকে জীবিকা ও খাদ্যের জন্য জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল এতদঞ্চলের মানুষদের উৎখাত করার কাজে নেমে পড়ে একটি শক্তিশালী চক্র। কোটি কোটি টাকার কাঠ ও পাতার ঠিকাদার-ব্যবসায়ী-মাফিয়া বাহিনী, সিপিএম দলের নেতারা, ফরেস্ট অফিসার ও কর্মচারীদের অধিকাংশ এবং পুলিশের অধিকাংশের কুটিল শয়তান চক্র জঙ্গলের উপর একাধিপত্য কায়েম করেছে। জঙ্গলের প্রাণী শিকার, ফলমূল-পিঁপড়ের ডিম, মধু-শালপাতা-কেঁদুপাতা-বাবুইঘাস ও জ্বালানি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহের অধিকার থেকে এলাকার অধিবাসীদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করতে ডজন ডজন পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে অবর্ণনীয় অত্যাচার, নারীর ইজ্জতহানি, এমনকী হত্যা পর্যন্ত অবাধে চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে গরিবদের জন্য বরাদ্দ পঞ্চায়েতের টাকা স্তরে স্তরে নেতারা ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে, রেশন বন্ধ করে, চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিহ্ন করে আমলাশোলের মতো শত শত গ্রামের

হাজার হাজার গরিব মানুষজনকে নীরবে নিঃশব্দে অনাহারে মরতে বাধ্য করা হয়েছে। একদিকে শিক্ষা - স্বাস্থ্য - কর্মসংস্থান সহ আদিবাসী কল্যাণের নামে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের গালভরা কথার আড়ম্বর, অন্যদিকে আদিবাসী ছাত্রদের স্টাইপেন্ড, হোস্টেল গ্র্যান্ট, একলব্য আবাসিক বিদ্যালয়ের টাকা, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, অন্ত্যোদয় যোজনা, ইন্দিরা আবাস, ১০০ দিনের কাজের মজুরি ইত্যাদি বাবদ টাকা প্রায় পুরোটা চলে গেছে পঞ্চায়েতের মাতব্বর, সরকারি আমলা আর স্তরে স্তরে শাসকদলের নেতাদের পকেটে। এসব নিয়ে বা কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই পুলিশ ক্যাম্পে তুলে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুর অত্যাচারের পর সিপিএম নেতাদের মাধ্যমে শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন

ছয়ের পাতায় দেখুন

'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবে'র নামে

কৃষিক্ষেত্রে শোষণ তীব্র করার নয়া নীল নক্সা

আমাদের শাসকরা কৃষিতে বিরাট সাফল্যের কথা শোনাতে শোনাতে হঠাৎ 'গেল গেল' রব তুলছে। দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার নাকি কমছে উদ্বেগজনক ভাবে। কোটি কোটি ভুখা মানুষের মুখে খাদ্য তুলে দিতে তাই চাই 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব'। শুধু ভারতে নয়, এই আওয়াজ এখন বিশ্বের সর্বত্র।

একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় কৃষি আজ বহুমুখী সংকটের মুখোমুখি। প্রথমত, তথাকথিত সবুজ বিপ্লবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার আশির দশকের শেষ দিকেই কমতে শুরু করেছিল। শুধু সরকারি সাফল্য দেখাতে সংখ্যাতত্ত্বের মারপ্যাঁচ দিয়ে দীর্ঘদিন উৎপাদন বৃদ্ধির হার ঊর্ধ্বমুখী দেখানো হচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, বীজ, সার, কীটনাশক, আগাছানাশক ও সেচের জন্য খরচ প্রচুর পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে এবং ফসলের ন্যায্য দাম চাষিকে না দেওয়ায় কৃষি অলাভজনক পেশায় পরিণত হয়ে উঠেছে। তৃতীয়ত, খাদ্যশস্য চাষের পরিবর্তে অর্থকরী ফসল চাষে উৎসাহ দেওয়ায় চাষিরা সেই দিকেই ঝুঁকেছে এবং সেসব চাষে খরচ বেশি হওয়ায় ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি চাষিরা ব্যাংক ও মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছে। ফলে ফসল নষ্ট হওয়ায় বা ফসলের লাভজনক দাম না পাওয়ায় তারা ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে এবং বহু চাষি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। চতুর্থত, বিভিন্ন কোম্পানি হাইব্রিড বীজ, জি এম বীজ, উচ্চফলনশীল জাতের বীজ উৎপাদন করছে যা চাষিদের পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। বেশি ফলনের আশায় চাষিরা সেসব বীজ কিনে চাষ করতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে পুরাতন দেশি জাতগুলি দ্রুত অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং অসংখ্য অমূল্য জিন প্রকৃতি থেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাচ্ছে। জি এম ফসল চাষের ফলে ব্যাপকভাবে জিন দূষণ ঘটছে এবং বহু এলাকায় কৃষিতে বিপর্যয় ডেকে আনছে। পঞ্চমত, অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক প্রভৃতি ব্যবহার করার ফলে উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে পরিবেশ দূষণ। ষষ্ঠত, সারের ব্যবহার বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার কারণে একটা পর্যায়ের পর এখন উৎপাদন বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী হওয়ায় কৃষি ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি হয়েছে।

অন্যদিকে বীজ, সার, কীটনাশক,

চারের পাতায় দেখুন

গ্রামীণ সমস্যা নিয়ে বজবজে বিক্ষোভ সমাবেশ

সংশোধিত বিপিএল তালিকা প্রকাশ; ১০০ দিনের কাজ প্রদান, কাজ দিতে না পারলে ভাতা; অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের পরিচয়পত্র প্রদান; খাল সংস্কার; রেশন-কেরোসিন-সার ও কীটনাশক সামগ্রীর কালোবাজারি রোধ; বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং মূল্যবৃদ্ধি রোধ সহ দশ দফা দাবিতে এস ইউ সি আই বাওয়ালি, বিড়লাপুর এবং রায়পুর লোকাল কমিটিগুলির আহ্বানে গরিব খেটে-খাওয়া সহস্রাধিক মানুষ ২০ নভেম্বর বজবজ ২নং ব্লক অফিসে বিক্ষোভ দেখায়। সমাবেশে দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পাঠ করেন কমরেড রীনা বক্সি। বাওয়ালি-বিড়লাপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অজয় ঘোষের নেতৃত্বে কমরেড বাসুদেব কাবড়ি, সেখ রবিয়াল, উত্তম পাল সহ ৪ জনের প্রতিনিধিদল ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের সাথে আলোচনা করেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেডস সেখ মহিনুদ্দিন, আসগার আলি, প্রদ্যুৎ কাবড়ি, সাগর ঘোষ প্রমুখ। রায়পুর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড তাম্রধ্বজ আদক সভা পরিচালনা করেন।

ছাত্রী খুনের প্রতিবাদে চাপড়ায় ১২ ঘণ্টা ধর্মঘট

নদীয়ার চাপড়া থানার অন্তর্গত সীমান্তবর্তী হাটখোলা গ্রামের বাসিন্দা দশম শ্রেণীর ছাত্রী খুকুলি খাতুনকে এক বি এস এফ জওয়ান নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করে। ঘটনাটি ঘটে ১৯ নভেম্বর। ঐ বি এস এফ জওয়ান মদ্যপ অবস্থায় একটি বাড়িতে ঢুকে ঐ বাড়ির এক মহিলার সাথে অশালীন আচরণ করে। মহিলা প্রতিবাদ করায় তাকে মারধর করতে শুরু করে। ঐ সময়ই মহিলার ছোট বোন খুকুলি মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দিদিকে জওয়ানের হাতে প্রহৃত হতে দেখে বাধা দেয়। তখন ঐ উন্মত্ত মদ্যপ জওয়ান বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে খুকুলিকে গুলি করে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে এলাকার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

ঘটনার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই চাপড়া লোকাল কমিটির ডাকে ২১ নভেম্বর চাপড়ায় ১২ ঘণ্টা বনধ পালিত হয়। বনধের দাবি ছিল (১) ঘাতক জওয়ানকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, (২) নিহত খুকুলি খাতুনের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং (৩) সীমান্তবর্তী এলাকার সমস্যাগুলির অবিলম্বে স্থায়ী সমাধান করতে হবে। এ আই ডি এস ও ঐ দিনই জেলায় প্রতিবাদ দিবস পালন করে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে স্থানীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের সেমিনার

'জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন' নিয়ে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে ১ নভেম্বর গ্রান্ট হলে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে দু'শতাধিক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ প্রণব সেন। আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ডাঃ তরুণ মণ্ডল। হাঁপানি নিয়ে আলোচনা করেন জেলার বিশিষ্ট চেষ্ট স্পেশালিস্ট ডাঃ সৈকত বটব্যাল। এছাড়া চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নির্মল সাহা, পি ব্যানার্জী, সামসুল হক, করিম বক্স, এম. এ. সবুর, অবনীশ সিন্‌হা, তপন মুখার্জী উপস্থিত ছিলেন। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের জেলা সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম বলেন, তাঁরা জেলার সর্বত্র সেমিনার, আলোচনা সভা, মেডিকেল ক্যাম্প করার ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজাল্ট বিপর্যয়

এ আই ডি এস ও-র ডেপুটেশন

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলিতে ডিগ্রীস্তরে পার্ট ওয়ান-পার্ট টু পরীক্ষায় ভয়াবহ রেজাল্ট বিপর্যয়ের শিকার ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী। এই অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের অবিলম্বে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা নেওয়া এবং অভিযোগকারী ছাত্রছাত্রীদের অবিলম্বে খাতা দেখানোর দাবিতে ২৫ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে এ আই ডি এস ও প্রতিনিধিরা ডেপুটেশন দেন। উপাচার্য জানান যে তিনি ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে ২ ডিসেম্বর সহ-উপাচার্য ও অন্যান্য আধিকারিকদের সাথে মিটিং করবেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে, পরীক্ষায় কোনও একটি বিষয়ে অকৃতকার্য ছাত্রদের এক বছর সময় যাতে নষ্ট না হয় সে বিষয়টি তিনি সহানুভূতির সাথে দেখবেন। তিনি এও জানান যে, কোনও কলেজ অধ্যক্ষ যদি সহ উপাচার্যের কাছে রিভিউয়ের আবেদন জানান তবে তা স্পেশাল রিভিউ হিসেবে গণ্য হবে এবং তার জন্য কোনও অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নেবে না।

পাথরপ্রতিমা নাগরিক কমিটির আন্দোলনের জয়

দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমা ব্লক নাগরিক কমিটির আহ্বানে হাজার হাজার মানুষ ১৭ নভেম্বর বিডিও-র সামনে বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হন। ব্লকের ১৫টি অঞ্চলে ৫২ হাজার রেশন কার্ডের দাবিতে শিশুকোলে মহিলা সহ চার হাজারেরও বেশি মানুষ সুসজ্জিত মিছিল সহকারে এই অবস্থানে সামিল হন। এছাড়াও দাবি ছিল — ১০০ দিনের কাজ দিতে না পারলে ভাতা দিতে হবে, গরিবদের সকলকে বিপিএল কার্ড দিতে হবে, রাস্তা, নদীঘাট, পানীয় জল, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ ও পরিবহনের উন্নতি করতে হবে, মদ-জুয়া-নারী পাচার ও স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা বন্ধ করতে হবে, স্থায়ী নদীবাঁধ-রিং বাঁধে গৃহীত জমির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, মৎস্যজীবীদের অধিকার রক্ষা করতে হবে, ফসলের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে, মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে ইত্যাদি।

নাগরিক কমিটির সম্পাদক সুশান্ত দিণ্ডা, অশোক মাইতি, প্রভঞ্জন মণ্ডল, পঞ্চানন দাস, মঞ্জু মণ্ডল এবং প্রতিটি অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিরা ব্লক আধিকারিকের কাছে ৫২ হাজার রেশন কার্ডের আবেদনপত্র ও স্মারকলিপি জমা দেন। ব্লক আধিকারিক সকল মানুষের বয়স অনুযায়ী রেশন কার্ড যত দ্রুত সম্ভব দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর অবস্থান কর্মসূচি শেষ হয়।

বাজার বন্ধ ও হাওড়া ব্রিজ অবরোধ ফুলচাষিদের

রাজ্যের বৃহত্তম মল্লিকঘাট ফুলবাজারে অবিলম্বে বিদ্যুৎ দেওয়ার দাবিতে ১৪ নভেম্বর ৩ ঘণ্টা ব্যবসা বন্ধ এবং হাওড়া ব্রিজ অবরোধ করেন সহস্রাধিক ফুলচাষি-ব্যবসায়ী। ৪৫ মিনিট অবরোধ চলার পর বিরাট পুলিশবাহিনী লাঠিচার্জ করে অবরোধ ভাঙে এবং কমিটির যুগ্মসম্পাদক, সহসম্পাদক সহ ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে লালবাজারে নিয়ে যায়। অবরোধে নেতৃত্ব দেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অশোক গিরি, হৃদয়রঞ্জন জানা, সহসম্পাদক গৌতম সমাদ্দার, কৃষ্ণচন্দ্র বেরা। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস, সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। পুলিশ সঞ্জিত বিশ্বাস ও অবরোধে উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা স্বপন বর্মন সহ আরও কয়েকজনের নামে মামলা দায়ের করে।

প্রায় ৭ মাস যাবত বাজারের কয়েক হাজার ফুলচাষি-ফুলব্যবসায়ী-দোকানদার অন্ধকারে দিন গুজরান করছেন। বিদ্যুতের দাবিতে তাঁরা কমিটির নেতৃত্বে ১৫ সেপ্টেম্বর মিছিল করে হর্টিকালচার দপ্তরের প্রধান সচিব ও সিইএসসি-র জি এম (এল টি)কে স্মারকলিপি দিলে তিনি বলেছিলেন পুজোর পর বিদ্যুৎ দেওয়া হবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে শাসকদলের অঙ্গুলি হেলনে হর্টিকালচার দপ্তর, বাজারে যাতে বিদ্যুৎ না দেওয়া হয় তার জন্য সিইএসসি-কে চিঠি পাঠিয়েছে। এরই প্রতিবাদে এই ব্যবসা বন্ধ এবং ব্রিজ অবরোধ।

ফুলচাষি-ফুলব্যবসায়ীদের উপর পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে ২১ নভেম্বর ফুল বাজারের সামনে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মদন মিত্র, সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির যুগ্মসম্পাদক বেচারাম মান্না, সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক, বিধায়ক তারক বন্দ্যোপাধ্যায়, সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির (অ্যাবেকা) রাজ্য নেতা সত্যেন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

হাওড়ায় শ্রমিকদের শিক্ষাশিবির

১৯ নভেম্বর অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি হাওড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরি হলে কলকারখানার শ্রমিক ও খেতমজুরদের একটি রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামাঞ্চলের নানা পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের এই শিবিরে যোগদান ছিল উল্লেখযোগ্য। শিবির পরিচালনা করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা। সমাজপরিবর্তনের পরিপূরক যথার্থ শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি গুরুত্ব দেন; মালিকরা কীভাবে শ্রমিকদের শোষণ করে তা অতি সহজভাবে তুলে ধরেন। সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর আর্থিক মন্দার মূল কারণগুলি তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

কোচবিহারে চাষিদের রেল অবরোধ

কৃষিঋণ মকুব, নতুন ঋণ প্রদান, সারের কালোবাজারি রোধ প্রভৃতি দাবিতে ২৭ নভেম্বর নিউ কোচবিহার স্টেশনে ২ শতাধিক কৃষক 'আলু-পাট-ধান চাষি সংগ্রাম কমিটির' নেতৃত্বে এক ঘণ্টা রেল অবরোধ করে। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক নৃপেন কার্জি, প্রাক্তন সাংসদ দেবেন্দ্রনাথ বর্মন, আছরউদ্দিন আহমেদ, উপেন বর্মন, দুধকুমার বর্মন প্রমুখ

হলদিয়া বন্দরের সংকট সরকারি অবহেলারই পরিণাম

বছরের পর বছর ধরে নদীর তলদেশে জমা হওয়া মাটি যন্ত্রের সাহায্যে কেটে তুলে ফেলে নাব্যতা বাড়ানোর (ড্রেজিং) ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অবহেলার ফলে হলদিয়া বন্দর চ্যানেলে জমে ওঠা পলিমাটি আজ জাহাজ চলাচলে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ড্রেজিং-এর অবহেলায় তৈরি হওয়া এই সংকটের দায় হলদিয়া বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকারের জাহাজ মন্ত্রক কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তাছাড়া হলদিয়া চ্যানেলে ড্রেজিং করার জন্য নির্ধারিত ড্রেজার, কোন যুক্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ুর সেতুসমুদ্রম্ প্রজেক্টে পাঠিয়েছিল তার সন্তোষজনক উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

হলদিয়া বন্দরের সংকটের ফলে হলদিয়া শিল্পাঞ্চলেই শুধু নয়, গোটা পূর্বভারতেই সংকটের ছায়া পড়বে। অথচ বন্দর কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতিকে লঘু করে দেখানো, প্রকৃত ঘটনা আড়াল করা ইত্যাদির সাথে 'বন্দর বাঁচাও আন্দোলন'কারীদের তুলে ধরা তথ্যকে অজ্ঞানতাপ্রসূত ও ভুল বলে বিবৃতি দিয়েছেন। গত ২৮ অক্টোবর দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় চেয়ারম্যানের বক্তব্য হিসেবে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে — 'অনেকেই নদীর গভীরতা ও নাব্যতার পার্থক্যটা বোঝেন না বলেই হলদিয়া বন্দরের সংকটকে ভয়াবহ করে দেখানোর চেষ্টা করছেন। আসলে হুগলি নদীর নাব্যতা ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে যে ৭.১ মিটার ছিল, তা থেকে এবার বিন্দুমাত্র কমেনি।' কিন্তু সংবাদে প্রকাশ, বর্তমানে বন্দর কর্তৃপক্ষ নাব্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'under keel clearance' পূর্বের তুলনায় ০·৩৫ মিটার কমিয়ে দিয়ে বলছেন যে, গত বছর ডিসেম্বরের সমান নাব্যতা, এ'বছর ডিসেম্বরেও থাকছে। পূর্বে ঐ clearance ধরা হত ১.২৫ মি, আর এখন ধরা হচ্ছে ০·৯ মিটার। অর্থাৎ ড্রেজিং-এর দ্বারা নাব্যতার উন্নতি না ঘটিয়ে নদীর তলদেশ থেকে সতর্কতামূলক আবশ্যিক ছাড়ের পরিমাণ কমিয়ে নাব্যতাকে গত বছরের সমান করে দেখানো হচ্ছে। [নাব্যতা = বিনা জোয়ারে চ্যানেলের গভীরতা + জোয়ারের উচ্চতা – নদীর তলদেশ থেকে সতর্কতামূলক আবশ্যিক ছাড়]

যাই হোক, গত তিন মাস ধরে সমস্ত স্তরের বন্দর কর্মচারীদের ধারাবাহিক প্রতিবাদ, প্রচার, বিক্ষোভ আন্দোলনের ফলে ১৬নং ড্রেজার সহ ছ'টি ড্রেজার অকল্যান্ড/ জেলিংহামে কাজ করতে শুরু করেছিল। এখন ১৬নং ড্রেজারটি মেরামত করতে যাওয়ায় ড্রেজারের সংখ্যা হয়েছে পাঁচটি। প্রয়োজনের তুলনায় ড্রেজারের সংখ্যা খুবই কম। কমপক্ষে দশটি ড্রেজারের এক সাথে ড্রেজিং করা দরকার। তাছাড়া ড্রেজিং করা পলিমাটি নদীর ওপরেই সমুদ্র অভিমুখে কিছুটা নিচে গিয়ে যেখানে জমা (ডাম্পিং) করা হচ্ছে, তার আশপাশে চ্যানেলের অবস্থাও ভাল নয় — সেখানে চড়া পড়তে শুরু করেছে। ফলে ডাম্পিং বন্ধ করে, ড্রেজিং করা পলিমাটি অবশ্যই অতি দ্রুত ডাঙায় ফেলার বন্দোবস্ত করতে হবে। ড্রেজিং-এর মাটি পাইপ লাইনের মাধ্যমে ডাঙায় ফেলার বন্দোবস্ত হলে ড্রেজিং-এর পরিমাণও বহুগুণ বেড়ে যাবে। বন্দরের চেয়ারম্যান অভিযোগ করেছেন যে, ড্রেজিং-এর মাটি ডাঙায় ফেলার জন্য ২৫০০ একর জায়গা, ২০০৫ সাল থেকে রাজ্য সরকারের কাছে চেয়ে আসছেন কিন্তু রাজ্য সরকার সে ব্যবস্থা করেনি। অথচ এ জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি পাওয়া অসম্ভব কিছু নয় এবং কৃষকদের স্বার্থ কোনও ভাবে ক্ষুণ্ণ না করেও এই ব্যবস্থা করা সম্ভব।

কিন্তু এই সবকিছুই সমস্যার সাময়িক সমাধানে সাহায্য করবে মাত্র। কেননা 'মেন্টেন্যান্স ড্রেজিং'-এর সাথে সাথে দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য 'ক্যাপিটাল ড্রেজিং' অবশ্য প্রয়োজন — যা দীর্ঘ দুই দশকের অধিক কাল ধরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত। বিগত শতাব্দীর শেষ লগ্নে রাজ্য সরকার যখন কুলপিতে আরও একটি ছোট বন্দর গড়ার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল, সে সময় হলদিয়া চ্যানেলে ক্যাপিটাল ড্রেজিং-এর পরিকল্পনা অনেক দূর এগিয়ে গেলেও রাজ্য সরকার আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, হলদিয়ায় কাটা পলিমাটি স্রোতের টানে কুলপির প্রস্তাবিত বন্দর এলাকায় চলে এসে সেখানে নাব্যতার সংকট সৃষ্টি করতে পারে। এ ঘটনার পর হলদিয়া চ্যানেলে ক্যাপিটাল ড্রেজিং করার প্রচেষ্টা আর এগোয়নি। সে সময় ক্যাপিটাল ড্রেজিং-এর দাবিতে বন্দর শ্রমিকদের একটি যৌথ আন্দোলন শুরু হলেও তেমন করে দানা বাঁধেনি। কিন্তু বর্তমান সময়ে খুবই আশার কথা যে, বন্দরে চারটি ইউনিয়নের সাথে অফিসার্স ফোরামও যুক্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলছে। এই আন্দোলনে যুক্ত সর্বস্তরের বন্দর কর্মচারীদের আজ এটা বোঝা দরকার যে, বন্দরের সংকটের সাথে বন্দরনগরী তথা শিল্পাঞ্চলের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমজীবী জনসাধারণের সমস্ত অংশের বোঝা দরকার, এ আন্দোলন শুধুমাত্র বন্দর-শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলন নয়, হলদিয়া শিল্পাঞ্চল সহ সমগ্র জনগণের আন্দোলন। বস্তুত এই ইস্যুটি আজ গণআন্দোলনের ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। ফলে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারী সহ শ্রমজীবী জনসাধারণকেও এই বন্দর আন্দোলনের সাথে সামিল করা দরকার। ফলে শুধু শ্রমিক-কর্মচারী নয়, ছাত্র, যুব, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক — এক কথায়, সচেতন সমস্ত নাগরিকের এ আন্দোলনে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যাতে এ আন্দোলন যথার্থই এক গণআন্দোলনে পরিণত হয়।

সরকারি হিসাবে দারিদ্রসীমা এখনও ৪৫৫ ও ৩২৮ টাকা!

সরকারি হিসাবে মুদ্রাস্ফীতির হার কমেছে। অক্টোবরে এই হার ছিল ১০.৭২ শতাংশ, গত সপ্তাহে কমে হয়েছে ৮.৯ শতাংশ। সাধারণভাবে মুদ্রাস্ফীতির হার কমা বলতে জিনিসপত্রের দাম কমে যাওয়াকেই মানুষ বোঝে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম এখন অত্যন্ত চড়া। তা সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি কমছে কী করে? আসলে চাল, ডাল, তেল, শাক-সবজি'র দাম আকাশছোঁয়া হলেও এই সময়ের মধ্যে লৌহ-ইস্পাত ইত্যাদি ধাতু সহ সিমেন্ট ইত্যাদির দাম কমেছে। মূলত এগুলির দাম ধরে হিসাব করা হয় বলে মুদ্রাস্ফীতির হার কমে গেছে বলে দেখানো সম্ভব হয়েছে।

এভাবে মুদ্রাস্ফীতির হার কমিয়ে দেখানোর পিছনে সরকারের একটি উদ্দেশ্য কাজ করছে। মুদ্রাস্ফীতির হার কমলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে কম সুদের হারে টাকা ধার দেওয়া সম্ভব হয়। যে পরিমাণ নগদ অর্থ আর বি আই-এর কাছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখতে হয়, (ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও বা সি আর আর) মুদ্রাস্ফীতির হার কমলে সেই নগদ অর্থের পরিমাণও কমিয়ে দিতে পারে আর বি আই। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে তখন ঋণ দেওয়ার জন্য অর্থের পরিমাণ আরও বেড়ে যায় এবং কম সুদের হারেই সেই টাকা তারা ধার দিতে পারে। এতে সুবিধা হয় ঋণগ্রহীতাদের, অর্থাৎ যারা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নেন তাঁদের। মূলত তিনটি কারণে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া হয় — এক, ভোগ্যপণ্য কেনার জন্য, দুই, শিল্পে বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করার জন্য এবং তিন, শিল্প বাণিজ্যের রোজকার খরচ চালাবার জন্য। সুদের হার কমলে পুঁজি বিনিয়োগের খরচ কমে যায়, অন্যদিকে ক্রেতারা ঋণ করে কেনার সুযোগ পায় বলে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করা তাদের পক্ষে সহজ হয়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি বাড়ে। দিন আনা-দিন খাওয়া মানুষের অবস্থার কোনও হেরফের না হলেও দেশের উচ্চবিত্ত একাংশ মানুষের সুবিধা হয়। জাতীয় আয় বাড়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। সব মিলিয়ে মুদ্রাস্ফীতির হার কমায় সরকারের নেতা-মন্ত্রী-আমলা এবং ব্যাঙ্কের বড়কর্তারা খুশি। তাঁরা বলছেন, মুদ্রাস্ফীতির হার এইভাবে কমতে থাকলে ব্যাঙ্ক ঋণের সুদও অচিরে কমবে এবং দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ঘটার পথ পরিষ্কার হবে। অর্থাৎ জাতীয় আয় তথা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার বাড়বে— দেশের 'উন্নয়ন' হবে।

প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী থেকে শুরু করে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞের দল এখন 'উন্নয়নে'র নেশায় মশগুল। যে করেই হোক প্রবৃদ্ধি বা 'গ্রোথ'-এর হার বাড়াতে হবে, নিদেনপক্ষে ঠিক রাখতে হবে। তাহলেই উন্নয়নের রথের চাকা বিনা বাধায় ঘুরতে থাকবে। ইতিমধ্যেই প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে পৌঁছেছে, ক্রমাগত তাকে বাড়িয়ে যেতে হবে।

প্রবৃদ্ধির হার যখন এত উঁচুতে, তখন কেমন আছে দেশের সাধারণ মানুষ? বস্তুত দেশের সাধারণ মানুষ ঠিক কী অবস্থায় রয়েছে, সত্যিকারের দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কত, বা কী হারে সাধারণ মানুষ নিঃস্ব হতে হতে দারিদ্রসীমার নীচে চলে যাচ্ছে তার কোনও খবর সরকার কিংবা তার আমলাদের কাছে নেই। তারা দারিদ্র পরিমাপের জন্য 'দারিদ্রসীমা' নামক একটি হিসাব খাড়া করেই দায় সেরেছেন। দারিদ্র মাপার এই হিসাব নিতান্তই হাস্যকর। জিনিসপত্রের দাম যতই আগুন হোক, এখনও শহরাঞ্চলে মাসে ৪৫৫ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে মাসে ৩২৮ টাকা রোজগার করতে পারলেই সরকারি হিসাবে কেউ আর দারিদ্রসীমার নীচে থাকবে না। মান্ধাতার আমলের এই হিসাবের ভিত্তিতে এখনও দরিদ্রের সংখ্যা মাপা হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যে এবং দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই ও কলকাতা শহরে এই দারিদ্রসীমার মাপ আলাদা আলাদা। কিন্তু সে হিসাবও আজকের বাজারদরের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। দিল্লিতে দৈনিক ১৭ টাকা আয় করতে পারলেই একজন আর দরিদ্র পদবাচ্য হবে না। আবার কলকাতা শহরে দারিদ্রসীমা হল দৈনিক ১৬ টাকা আয়। আজকের দিনে খুব সাধারণভাবে খেয়ে পরে বাঁচতে গেলেও দৈনিক ১৬ টাকা রোজগারে যে কিছুই হয় না এ কথা বলে বোঝাবার অপেক্ষা রাখে না। অথচ বছরের পর বছর ধরে সরকার এর ভিত্তিতেই দেশের দরিদ্রের সংখ্যা দেখিয়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষদের জন্য বিভিন্ন সময়ে যে সব বিভিন্ন প্রকল্প সরকার নিয়েছে, সেগুলি কার্যকর করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে রাজ্যে রাজ্যে দারিদ্রসীমার অন্তর্ভুক্ত মানুষের সংখ্যার হিসাবই বহুক্ষেত্রে অমিল। কোথাও কোথাও হিসাব পাওয়া গেলেও সে হিসাব পূর্ণাঙ্গ এবং সঠিকও নয়। সাধারণ মানুষের প্রতি সরকারের অবহেলা, উদাসীনতা কোন চরম পর্যায়ে পৌঁছলে তবে প্রশাসন সঠিক তালিকা তৈরির এই সামান্য কাজটুকুও ঠিক মতো করে না, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

লক্ষণীয় বিষয় হল, দারিদ্রসীমা হিসাবের সীমারেখা এতখানি অবাস্তব ও হাস্যকর রকমের কম হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতার ৬০ বছর পরে আজও সরকারি হিসাবেই দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে দেশের ২৬ শতাংশ মানুষ। ১৯৭৩ সালে এই হার ছিল ৫৪.৮ শতাংশ। গরিবের সংখ্যা কমছে বলে দেশের উন্নয়নের ঢাক পেটায় সরকারের নেতা-মন্ত্রী-আমলারা। কিন্তু এই মানুষগুলি কেমনভাবে বেঁচে আছে তার কোনও খবর এরা রাখে না শুধু নয়, এদের জন্য সরকারের বরাদ্দ করা প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করা গেল কি গেল না — তা নিয়েও এদের মাথাব্যথা নেই। অথচ এটুকু সুবিধার ব্যবস্থা করা গেলে এইসব হতভাগ্য মানুষগুলির দুরবস্থার সামান্য হলেও সুরাহা হত। তাছাড়া, শুধু দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষজনই নয়, এই সীমারেখার ঠিক ওপরের স্তরে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের জীবনের দুর্দশার হিসাবও এই সরকার রাখে না। তারা মত্ত প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর চেষ্টায়। এই প্রবৃদ্ধির হার বাড়া-কমার বিষয়টি শিল্পপতিশ্রেণীর মুনাফা বৃদ্ধি-হ্রাসের সঙ্গে যুক্ত, ফলে সে ব্যাপারে পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবাদাস এই সরকারের পক্ষে কোনও অবহেলাই যে করা চলে না! তাই তাদের লাভ-লোকসানের হিসাব দিয়েই উন্নয়নের হিসাব ঠিক হয়। দরিদ্র, সাধারণ মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও থেকে যায় তাদের হিসাবের বাইরে।

যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমরা রয়েছি, সেখানে একদিকে যেমন মেহনতি মানুষের রক্তশোষণ করে পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের সর্বোচ্চ মুনাফা লোটার কাজ চালিয়ে যাবে, তেমনি অন্যদিকে এই শোষণের পথে যাবতীয় বাধা হটানোর কাজ করে যাবে পেটোয়া সরকারগুলি। শতাংশের সরকারি হিসাবে যাই হোক, বাস্তবে দেশের অধিকাংশ মানুষই এই শোষণমূলক ব্যবস্থার জাঁতাকলে পড়ে ক্রমাগত অধিকতর দুর্দশায় তলিয়ে যেতে থাকবে। যেমন আজ মন্দার বাজারে মালিকের মুনাফায় টান পড়ার ফলে ছাঁটাইয়ের খড়্গ নেমে আসছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীর উপর। ফলে এই চূড়ান্ত শোষণমূলক ব্যবস্থা টিকে থাকলে মানুষের জীবনে সুখ-স্বস্তি আশা করাই অসম্ভব।

শিলিগুড়িতে পথ অবরোধ, লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার

পেট্রল-ডিজেলের দাম কমানো, পিটিটিআই সমস্যার সমাধান, সরকারি ৩ লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগ, সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক চাষিদের জমি ফেরত, লালগড়ে পুলিশি নিপীড়ন বন্ধ করা, উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা-বাগানের লীজ বাতিল করে সরকারি অধিগ্রহণ, সিংকোনা বাগিচার পুনরুজ্জীবন সহ জনগণের অন্যান্য ন্যায্য দাবি আদায়ে ২৪ নভেম্বর এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোড অবরোধ করা হলে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ অবরোধকারীদের উৎসাহ দেন। শিলিগুড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বিশাল পুলিশ বাহিনী এনে অবরোধ হঠানোর চেষ্টা করলে অবরোধকারীদের অনমনীয়তার কাছে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এরপর আরও বেশি সংখ্যক পুলিশ নিয়ে তারা অবরোধকারীদের উপর লাঠিচার্জ করে এবং জেলা সম্পাদক সহ মোট ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। সমগ্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য, শঙ্কর পাল, তন্ময় দত্ত, বিনয় সূত্রধর, রবি ঘোষ, ভগীন্দ্রনাথ রায়, দেবাশিস শর্মা, মুর্শেদ আলি প্রমুখ।

‘সবুজ বিপ্লবের’ নক্সার বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলুন

একের পাতার পর

আগাছানাশক, হরমোন, অনুখাদ্য, পাম্পসেট অর্থাৎ চাষের সমস্ত উপকরণের জন্য চাষিকে বাজারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে। এসব উপকরণ উৎপাদন ও বিক্রি করে বিভিন্ন কোম্পানি মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলে দৈত্যাকার মালটিন্যাশনালে পরিণত হয়েছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কৃষির সমস্ত কর্মকাণ্ড আজ এই দৈত্যাকার মালটিন্যাশনালদের কুক্ষিগত হতে চলেছে। তাদের মুনাফার দিকে লক্ষ রেখে, কী ধরনের বীজ, সার, কীটনাশক তারা তৈরি করবে তা কোম্পানিগুলিই ঠিক করছে।

এ ছাড়া বৃহৎ কোম্পানিগুলির স্বার্থে গত কুড়ি বছরে কৃষিক্ষেত্রে বহু আইনগত পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম সবুজ বিপ্লবের যুগ পর্যন্ত ফসলের জাতের উপর কোনও রকম পেটেন্ট আইন ছিল না। তার ফলে উচ্চফলনশীল জাতগুলি চাষ করার সাথে সাথে পরবর্তী বছরের জন্য চাষিরা বীজ সংরক্ষণ করতে পারত। আজ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নির্দেশে আমাদের দেশ সহ প্রায় প্রতিটি দেশেই ফসলের জাতের উপর পেটেন্টরাজ কায়েম হয়েছে। ফলে চাষিরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল থেকে নিজেদের জন্য বা বিক্রির জন্য বীজ সংরক্ষণের অধিকার হারিয়েছে। কৃষিপণ্যের বিপণনও আজ প্রায় পুরোপুরি বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত। ফসলের দাম নির্ধারণ করছে তারাই। এদের স্বার্থেই কৃষিপণ্যের খুচরো বিপণন আইন প্রণয়ন হচ্ছে।

এই সমস্ত কিছুর বিপর্যয়কর ফলাফল নেমে আসছে চাষিদের জীবনে। খাদ্যঘাটতি, কর্মহীনতা, ঋণগ্রস্ততার মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি কিছুই করছে না। ক্ষোভ বাড়ছে চাষিদের মধ্যে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের এই পর্যায়ে জনজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং সংকটগুলি মোকাবিলা করার নামে প্রতারণার কৌশল নিয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে তাদের আগ্রাসনকে আরও তীব্র করতে এই কাজে তারা নেমেছে এবং আওয়াজ তোলা হয়েছে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের।

ভারতবর্ষে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের জন্য আওয়াজ ওঠে ২০০৫ সালে। সে বছর জুলাই মাসে আমেরিকা সফরে গিয়ে মার্কিন কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছিলেন — ‘আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রেসিডেন্ট বুশ এবং আমি যৌথভাবে কৃষিক্ষেত্রে দ্বিতীয় দফার ভারত-মার্কিন সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছি’। এরপর বুশ এসেছিলেন ভারতে ২০০৬ সালের মার্চ মাসে ভারত-মার্কিন পারমাণবিক চুক্তি চূড়ান্ত করতে। কিন্তু সেই সময় নিঃশব্দে, অত্যন্ত গোপনে আরেকটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, যার নাম ‘ইন্দো-ইউএস ইনিশিয়েটিভ অন অগ্রিকালচারাল রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন।’ এ দেশের কৃষিবিজ্ঞানী ও কৃষি-প্রশাসনের প্রায় কোনও কর্মকর্তাই এখনও এই চুক্তির বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানেন না। এমন গোপনীয়তার মধ্যেও যতটুকু জানা গিয়েছে তা হল, এই চুক্তি অনুযায়ী জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও জৈব প্রযুক্তির যুক্ত-গবেষণায় ভারত সরকার মোট ৪০০ কোটি টাকা খরচ করবে। সেই সফরে এসে বুশ অন্ধ্রপ্রদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে এ দেশের কৃষির উন্নতিতে মার্কিন সহায়তার উল্লেখ করে ভারতের কৃষি উন্নয়নে মার্কিন বহুজাতিকদের শরিক হওয়ার কথা বলেছিলেন। তথাকথিত এই ইন্দো-ইউএস ইনিশিয়েটিভ-এর বোর্ড মেম্বার হিসাবে তাই নির্বাচিত হয়েছে আমেরিকার ওয়াল-মার্ট ও মনসান্টোর মতো কোম্পানির প্রতিনিধিরা।

২০০৬ সালের ৯ নভেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল ফোরাম অন এগ্রিকালচারাল রিসার্চের সম্মেলনে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালাম ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ক্ষুধা মেটাতে ২০২০ সালের মধ্যে কৃষি উৎপাদন ৩৪০ মিলিয়ন টন বৃদ্ধির জন্য সরকারিভাবে ‘দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব’-এর কথা ঘোষণা করেন। অন্যান্য দেশের সরকারগুলিও এই দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে।

তথাকথিত এই সবুজ বিপ্লবের বিশ্বায়নবাদী দিশা-নির্দেশ ঠিক হয়ে যাওয়ার পর কৃষি-ব্যবসায় যুক্ত মনসান্টো, সিনজেনটা, ডাও, বায়ার ক্রপ সায়েন্স, ডু-পন্ট, বি এ এস এফ প্ল্যান্ট সায়েন্স, কার্গিল প্রভৃতি বৃহৎ কোম্পানিগুলি প্রবল উৎসাহে তা সফল করতে নেমে পড়েছে। তারা বলছে যে, তাদের উৎপাদিত ও উদ্ভাবিত পণ্য দিয়েই এই বিপ্লব সফল করা যাবে। বায়ার ক্রপ সায়েন্সের চেয়ারম্যান ফ্রেডরিক বারশোয়ার বলেছেন, খাদ্য উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য কৃষি নিয়ে আমাদের সুসংহত গবেষণা চালাতে হবে এবং স্থানীয় সম্পদগুলির সম্ভাব্য সদ্ব্যবহার করতে হবে। আমাদের যা প্রয়োজন তা দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের থেকে কম নয়। আসরে নেমেছে বিভিন্ন দেশের চেম্বার্স অফ কমার্স, ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশন, ইউনাইটেড নেশনস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন, ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট প্রভৃতি সংগঠনও। তারা তৈরি করেছে গ্লোবাল অ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিজ ফোরাম এবং তারা তাদের পরিকল্পনা রূপায়িত করতে দেশে দেশে সম্মেলন করছে। এমনই একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১০ এপ্রিল ’০৮ দিল্লিতে। একইভাবে গত ২৪-২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার সায়েন্স সিটিতে ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব’ সফল করতে আলোচনাচক্র। অর্থাৎ মার্কিন প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে মনমোহন সিং, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সকলেই সামিল এই দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব সফল করতে।

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব স্লোগানটি গ্রহণীয় করে তোলার জন্য সরকার ও বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলি তাদের সুবিধামতো সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে প্রথম সবুজ বিপ্লবের নানা সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরছে। তারা বলছে যে, প্রথম সবুজ বিপ্লব শুধুমাত্র গম, ধান, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা — এই পাঁচটি ফসলেই সীমাবদ্ধ ছিল, বাকি ফসলগুলির প্রতি নজর দেওয়া হয়নি। যেসব এলাকায় এই পাঁচটি ফসল হয় না, সেসব এলাকা উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছে। বৃষ্টিনির্ভর এলাকায় কৃষির উন্নতির জন্য প্রায় কিছুই করা হয়নি। ফলে প্রথম সবুজ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক বৈষম্য বেড়েছে। তারা আরও বলছে যে, প্রথম সবুজ বিপ্লব শুধুমাত্র ফসলের উচ্চফলনের দিকে নজর দিয়েছে, ফসলের নিবিড়তার প্রতি উদাসীন থেকেছে। একই সঙ্গে প্রথম সবুজ বিপ্লব শ্রমসাশ্রয়কারী প্রযুক্তি ব্যবহার করায় গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের আশানুরূপ কর্মসংস্থান বাড়াতে পারেনি। তারা এও বলছে যে, অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় শুধু ধনী চাষিরাই প্রথম সবুজ বিপ্লব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং প্রান্তিক চাষিরা এর সুফল না পাওয়ায় গ্রামে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বেড়েছে।

উল্লেখ্য যে, সত্তরের দশকের সূচনায় যখন সবুজ বিপ্লব নিয়ে সরকারি স্তরে হইচই চলছে তখনই মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতবর্ষের শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে এদেশের কৃষি সমস্যা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘‘...এদেশের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী এই ক্ষয়িষ্ণু এবং প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাকে যতদিন সম্ভব টিকিয়ে রাখার জন্য ‘সবুজ বিপ্লব’, ‘জাপানি প্রথায় চাষ’, ‘তাই চুং’, ‘আই আর -৮’ — প্রভৃতি উৎপাদন বৃদ্ধির নানা রকম টোটকার ব্যবস্থা করছে।’’ এসবের দ্বারা গ্রামীণ জীবনের কর্মসংস্থানের সমস্যা, অর্থনৈতিক বৈষম্য — কোনও কিছুরই যে সমাধান হয়নি তা আজ এমনকী সরকার ও শোষক পুঁজিপতিদেরও স্বীকার করতে হচ্ছে। অবশ্য তারা কোনও সৎ উদ্দেশ্য থেকে এসব স্বীকার করছে না। এই সমস্যাগুলোর কথা তুলে ধরে তারা তাদের মুনাফাকেন্দ্রিক দাওয়াই বাতলে আরও বড় শোষণের পরিকল্পনা রচনা করছে।

এরা বলছে যে, দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব সফল করতে গেলে ড. স্বামীনাথনের নেতৃত্বে ‘জাতীয় কৃষক কমিশন’ যে সুপারিশগুলি করেছে তা কার্যকর করতে হবে। যেহেতু আমাদের দেশে ড. স্বামীনাথনকে সামনে রেখে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের প্রচার চলছে, তাই এ প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন। তিনি যত বড় কৃষিবিজ্ঞানী বলেই প্রচার চলুক না কেন, তাঁর বক্তব্য ও মতামত আদ্যন্ত স্ববিরোধিতায় ভরা। যে সবুজ বিপ্লবের জন্য তাঁকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়, সেই সবুজ বিপ্লব যখন আর এগোতে পারছে না, বরং ধনী-গরিবের বৈষম্য আরও প্রকট করেছে এবং সাথে সাথে জমি ও জল সম্পদ নষ্ট করছে, আর্সেনিক সহ নানা দূষণের সমস্যা সৃষ্টি করছে, তখন তিনি বলছেন, এটা ‘গ্রীন রেভোলিউশন’ নয় ‘গ্রীড রেভোলিউশন’ অর্থাৎ অর্থ-লালসার বিপ্লব (সায়েন্স রিপোর্টার, সেপ্টেম্বর ’০৬)। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম সরকার যে কৃষিনীতি গ্রহণ করেছে তা চূড়ান্ত জনবিরোধী ও কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে মিথ্যাচারে ভরা। এই কৃষিনীতিতে সিপিএম সরকার বলেছে যে, এ রাজ্যে আমন, আউশ ও বোরো মরশুমে মোট ৬.১০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয় এবং ২০১০ সালে এ রাজ্যে ধানের চাহিদা হবে ১৫.৫০ মিলিয়ন টন। যদি আমরা উৎপাদন বাড়িয়ে হেক্টর প্রতি ৩.৪ টন করতে পারি তবে ৪.৮০ মিলিয়ন হেক্টরেই ১৫.৬০ মিলিয়ন টন ধান উৎপন্ন হবে এবং ১.৩০ মিলিয়ন হেক্টর জমিকে চাষ থেকে মুক্ত করে আমরা অন্য ফসল চাষ করতে পারব। সিপিএম সরকারের এসব প্রতারণামূলক কথা বিশ্বাস করে ড. স্বামীনাথনের নেতৃত্বে জাতীয় কৃষক কমিশন কৃষি উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গকে ‘ঘুমন্ত দৈত্য’ হিসাবে চিহ্নিত করেছে (বর্তমান, ৬ অক্টোবর, ’০৬)। কিন্তু আমরা জানি, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও কৃষক আজ কী দুর্দশার মধ্যে আছে! সরকার দাবি করার এবং স্বামীনাথন তা বিশ্বাস করার পরই পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে এবং কেন্দ্র এ রাজ্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে বলে সিপিএম কেন্দ্রকে দোষারোপ করছে। কৃষক কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে স্বামীনাথন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, ‘‘শিল্পায়ন ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণের ছুতোয় রাজ্যে রাজ্যে উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে নেওয়াটা রীতিমতো বিতর্কিত বিষয় হয়ে উঠেছে। আমরা (কমিশন) মনে করছি গোটা দেশেই কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমশ কমছে, সংকুচিত হচ্ছে। এটা খুবই উদ্বেগের ব্যাপার।’’ তিনি মন্তব্য করেন, ‘‘দেশে শিল্প নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু কৃষি ও কৃষকের বিরোধিতা করে কখনও শিল্প হতে পারে না। কৃষি ও কৃষককে আর্থিকভাবে মজবুত-শক্তিশালী না করতে পারলে দেশে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব অসম্ভব’’ (বর্তমান, ৬ অক্টোবর ’০৬)। এটুকু শুনলে মনে হবে যে তিনি অত্যন্ত কৃষকদরদী। তিনি এও জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজমির পরিমাণ জনসংখ্যার তুলনায় আরও কম। অথচ তিনিই আবার সিঙ্গুরে অত্যন্ত উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে টাটার মোটর কারখানার পক্ষে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে টাটাদরদী হয়ে ২১শে সেপ্টেম্বর ’০৮ আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখেছেন — ‘‘কৃষির উপর থেকে চাপ কমাতে আমাদের অকৃষি ক্ষেত্রের উপর জোর দিতে হবে। আমার নেতৃত্বে ‘ন্যাশনাল কমিশন অন ফার্মারস্’ যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতেও এই কথাই বলা হয়েছে। আর ঠিক এই প্রেক্ষিতেই সিঙ্গুরে টাটাদের ন্যানো কারখানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’’

এবার দেখা যাক জাতীয় কৃষক কমিশনের রিপোর্টে তিনি কী বলেছেন। প্রথম ‘সবুজ বিপ্লবের’ শেষে দেশের কৃষকরা কী রকম ভয়াবহ দুর্দশার মধ্যে আছে তা তিনি তাঁর রিপোর্টে তুলে ধরেছেন। গত কয়েক বছরে লক্ষাধিক কৃষকের মর্মান্তিক আত্মহত্যার উল্লেখও তাঁর রিপোর্টে আছে। সরকারের সদিচ্ছার প্রতি বিশ্বাস রেখে তাদের করণীয় সম্পর্কেও তিনি কিছু ভাল ভাল কথা বলেছেন। কিন্তু তার সাথে কৃষিতে ও কৃষি বিপণনে বৃহৎ পুঁজিপতিদের অবাধ প্রবেশের সুপারিশও তিনি করেছেন। ক্ষুদ্র জোতের মালিকদের বড় বড় বিপণন গোষ্ঠীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ‘ব্র্যান্ড’ নামে ফসল উৎপাদন করতে সুপারিশ করেছে কমিশন। সবজি, ফল, ফুল, বীজ, আখ, দানাশস্য প্রভৃতির ফসলের চুক্তি চাষ এবং বায়ো-ফুয়েলের জন্য শিল্পগোষ্ঠী ভিত্তিক চাষের সুপারিশ করেছে কৃষক কমিশন। বহু কথার মারপ্যাঁচের পর সরকারি খামারগুলিকে এন জি ও-গুলির হাতে তুলে দিতেও কৃষক কমিশন সুপারিশ করেছে। শুধু তাই নয়, কৃষকের নিজের ফসল থেকে বীজ রাখা ও তার বিক্রির অধিকার হরণকারী ‘উদ্ভিদের বৈচিত্র্য সুরক্ষা ও কৃষকের অধিকার আইন (২০০১)’ নামক ফসলের জাত-এর পেটেন্ট আইন, যা গ্যাট চুক্তি রূপায়ণের বাধ্যবাধকতার জন্য করতে হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকার বিল পেশ করার সময় নিজেই স্বীকার করেছে, তাকেও সমর্থন করেছে জাতীয় কৃষক কমিশন।

ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সও ভারতের দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবে অংশ নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। তারা তাদের সুপারিশে ক্ষুদ্র চাষিদের গ্রুপ তৈরি করে বড় বড় কৃষিভিত্তিক শিল্পগোষ্ঠীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে চাষ করার প্রস্তাব রেখেছে সেপ্টেম্বর মাসের কলকাতার আলোচনাচক্রে। ২০০৫ সালের ২২ অক্টোবরের ‘বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড’-এর তথ্যসূত্র অনুযায়ী রিলায়েন্স আম চাষে ৫০০০ কোটি টাকা, ডি সি এম শ্রীরাম আখ চাষে ৫০০ কোটি টাকা, আই টি সি নানা রকম ফসলের জন্য ১৮০০ কোটি টাকা, ফিল্ড ফ্রেশ ফুড্‌স ২২০ কোটি টাকা, গ্লোবাল গ্রিন কোম্পানি ১০০ কোটি টাকা কৃষি বিপণন ও কৃষিশিল্পের ব্যবসায় নিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছে। আর ২০০৮ সালে আরও বহু দেশি-বিদেশি কোম্পানি খুচরো ও পাইকারি কৃষি বিপণনে নেমেছে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে। এদের এই ব্যবসা যাতে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে, তথাকথিত ‘দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব’-এর নানা আলোচনার ছত্রে ছত্রে তারই বর্ণময় বর্ণনা আছে।

আর চাষের খরচ যখন আজ আরও বাড়ছে, তখন চাষিদের অর্থ জোগানের জন্য তারা নাবার্ডকে সুপারিশ করছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক নয়, মাইক্রো ক্রেডিট ইনস্টিটিউশন তৈরি করে কৃষকদের ঋণের ব্যবস্থা করতে।

বিশ্বব্যাংক, বহুজাতিক কোম্পানি, ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, কেন্দ্র বা বিভিন্ন রাজ্য সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যত দাওয়াই দিচ্ছে ততই দেশের সাধারণ কৃষকরা আরও বড় বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। দেখা গেছে, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ সহ যে সব এলাকায় বহুজাতিকরা তাদের বীজ, সার প্রভৃতি নিয়ে এবং নানা সংস্থা ঋণ নিয়ে যত বেশি হাজির হয়েছে, কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনাও সেই সব এলাকায় ঘটেছে তত বেশি। ২০০৬ সালের ১৮ মে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ারের লোকসভায় দেওয়া হিসাব অনুযায়ী

ছয়ের পাতায় দেখুন

আমেরিকার ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টির জাতীয় সম্মেলনে কমরেড নীহার মুখার্জীর শুভেচ্ছা বার্তা

১৫-১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত আমেরিকার ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টির জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৩ নভেম্বর প্রেরিত এক শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, "আপনাদের জাতীয় সম্মেলন ও চলমান সংগ্রামের সাফল্য কামনা করে আমাদের দল সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে আমি আপনাদের উষ্ণ বিপ্লবী অভিনন্দন জানাচ্ছি। সমস্ত বিরুদ্ধতা উপেক্ষা করে আমেরিকায় শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আপনাদের প্রচেষ্টাকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে প্রশংসা করি। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে রাখার জন্য আপনাদের প্রয়াস বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর দলগুলির কাছে অনুপ্রেরণা। এই সম্মেলন এমন একটি সময়ে হচ্ছে যখন আমেরিকার জনগণ অর্থনৈতিক মন্দায় পুরোপুরি বিপর্যস্ত, লক্ষ লক্ষ মানুষ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে; আগ্রাসী যুদ্ধ ও দেশে দেশে হস্তক্ষেপের নীতির ভয়াবহ ফলাফলের সাথে প্রবল আর্থিক বিপর্যয় যুক্ত হয়ে আমেরিকার অবস্থা এখন ঘোরালো। এই অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাবে সমগ্র বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থারই এখন টালমাটাল অবস্থা। এমনকী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ১৯৩০-এর মহামন্দার থেকে বর্তমানের সংকট আরও ব্যাপক ও তীব্র এবং এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও পথই তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে প্রতিবিপ্লব ঘটিয়ে দেওয়ার পর বুর্জোয়াশ্রেণী পুঁজিবাদের পূর্ণ বিজয় ঘোষণা করে বলেছিল, সমাজতন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছে, তা কবরে চলে গেছে; আদর্শ হিসাবে মার্কসবাদ ব্যর্থ। এ সব কথা যে নিছক অর্থহীন ও কুৎসামাত্র তা উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে বর্তমান সংকট, যা মুমূর্ষু পুঁজিবাদের পচাগলা চেহারাটা নগ্ন করে দিয়েছে। সংকটের চক্রে পুঁজিবাদ যে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, যার থেকে তার নিস্তার নেই, এবং পুঁজিবাদ যে মৃত্যুযন্ত্রণায় ধুঁকছে, বর্তমান সঙ্কট তাও দেখিয়ে দিয়েছে। একইসঙ্গে এ কথাও আবার প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণ হয়েছে যে, পুঁজিবাদের সংকট সম্পর্কে মার্কসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ও অমোঘ। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অভ্রান্ততা জনগণকে পরিষ্কারভাবে ধরিয়ে দেওয়া, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষাগুলি তাদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, তার ভিত্তিতে বর্তমান সংকটের চরিত্র বিশ্লেষণ করে এর থেকে মুক্তির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পথটি সম্পর্কে তাদের সচেতন করা এই মুহূর্তে সকল বিপ্লবীদের জরুরি কর্তব্য।

আমরা লক্ষ করছি এবং সম্ভবত আপনারাও করেছেন যে, বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী এবং আপনাদের দেশের বুর্জোয়ারাও এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে সঙ্কটের পুরো বোঝাটা নিজের নিজের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ নির্লজ্জের মতো পুঁজিপতিদের বাঁচাতে ঢেলে দিচ্ছে। আমরা মনে করি, এই সন্ধিক্ষণে শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলাই সমস্ত প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। আশা করি, এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি আপনারা গভীরভাবে ভেবে দেখবেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটিতে থেকে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে আপনাদের আন্দোলন সারা বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করবে।

সম্মেলন শুরু হওয়ার সময়েই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়ে যাবে। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া ও নির্বাচনের ফলের তাৎপর্য এই সম্মেলন নিশ্চয় বিশদভাবে আলোচনা করবে। আমরা নিশ্চিত যে, আপনাদের সম্মেলন লক্ষ না করে পারবে না যে, নির্বাচনের ফল যা-ই হোক, ক্ষমতায় যেই আসুক, তার দ্বারা আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের কোনও মৌলিক পরিবর্তন হবে না। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং তার যুদ্ধবাজ নীতি, শোষণ, নির্যাতন, জাতি-বর্ণগত বৈষম্য, অভিবাসীদের প্রতি বৈষম্য — এর বিরুদ্ধে আমেরিকার শ্রমজীবী জনগণকে ধারাবাহিকভাবে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার উন্মেষ ও গোটা বিশ্বে তার বিকাশের যুগে, এই ব্যবস্থা ও তার নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে যতটুকু গণতন্ত্র ছিল, তার মধ্যে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার যতটুকু প্রতিফলন ঘটত, আজ তা সবই অতীতের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আজ সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে নির্বাচন প্রক্রিয়া একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দ্বারাই প্রায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয়। পুঁজিপতিদের বিশ্বস্ত রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে যে দলগুলি কাজ করে তাদেরই তারা অর্থ, পেশীশক্তি ও প্রচারমাধ্যমের সহযোগিতা দিয়ে ক্ষমতায় আনে। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, লেনিন-স্ট্যালিনের চিন্তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রামের ধারায় এস ইউ সি আইয়ের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের অন্যতম অগ্রণী মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনিবার্য সঙ্কটের মুখে পড়ে এবং সর্বহারা বিপ্লবের ভীতি থেকে পুঁজিপতিশ্রেণী আজ সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই ফ্যাসিবাদে আশ্রয় নেওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে ফ্যাসিবাদ আজ পুঁজিবাদী বিশ্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। তিনি দেখান, ফ্যাসিবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, অর্থনৈতিক কেন্দ্রিকতা, রাষ্ট্রের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার চূড়ান্ত কেন্দ্রীভবন, এবং আমলাতন্ত্র ও মিলিটারি-শিল্পপতি দুষ্টচক্রের উপর নির্ভরশীল অনমনীয় প্রশাসন। এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই রাষ্ট্র একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সেবাদাসে পরিণত হওয়ার দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যায়। এরই সাথে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে অধ্যাত্মবাদের মিশ্রণ ঘটিয়ে সাংস্কৃতিক রেজিমেন্টেশনের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদ দেশের মনন জগতে গেড়ে বসার চেষ্টা করে। এই যুগে বিশেষ পরিস্থিতিতে বাধ্য না হলে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা মিলিটারি একনায়কত্ব অনুসরণ করে না, এ কথাও তিনি বলেছিলেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করে তার প্রতিরোধকে দুর্বল করে দিতে সংবিধান এবং বহুদলীয় বা দ্বিদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থা বজায় রেখে গণতন্ত্রের মিথ্যা মুখোশ পরে থাকে ফ্যাসিবাদ। এই মুখোশের আড়ালে বাস্তবে আমলাতন্ত্র এবং মিলিটারি-শিল্পপতি দুষ্টচক্রের সাহায্যে পুঁজিপতিশ্রেণী প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদের নির্মম শাসন কায়েম করে।

আমরা মনে করি, গণতন্ত্রের আলখাল্লা পরা ফ্যাসিবাদী শাসনের এই বিপদকে বিশ্বের বিপ্লবীদের আজ অবশ্যই বোঝা দরকার এবং এ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার, যাতে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা ও নির্বাচনের মোহ থেকে জনগণকে মুক্ত করা যায়।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটির মধ্যে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে রাখার জন্য ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টির কষ্টসাধ্য সংগ্রামকে আমরা আবার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা মনে করি, এই সম্মেলনে আপনাদের বক্তব্য আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে বিশেষ অবদান রাখবে এবং আপনাদের আগামী দিনের আন্দোলন বিশ্বের স্বাধীনতাকামী ও শান্তিকামী মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে।"

আর্থিক মন্দা থেকে পুঁজিবাদ আমাদের মুক্তি দিতে পারে না

পাটনায় নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী সভায় কমরেড রণজিৎ ধর

১৭ নভেম্বর পাটনা আই এম এ হলে এস ইউ সি আই বিহার রাজ্য কমিটির উদ্যোগে নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দলের বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড শিবশংকর। সভার সূচনা করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং।

সভার প্রধান বক্তা এস ইউ সি আইয়ের কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপন করার জন্য আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি। এই নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমেই রাশিয়ার নিরক্ষর খেটে-খাওয়া মানুষরা সেদেশে শ্রমিকরাজ কায়েম করেছিল। এবং তা করেছিল মার্কসবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই। মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্র কাল্পনিক বিষয় নয়। মার্কসবাদ হল বিজ্ঞান, এক বিচারধারা। মার্কসবাদের ভিত্তিতেই আমরা দুনিয়াকে সঠিকভাবে জানতে পারি। এর মাধ্যমেই আমরা দেখতে পাই, পৃথিবী কীভাবে নিয়মের দ্বারা চালিত হয়ে পরিবর্তিত হচ্ছে। মানবসমাজের বিকাশের ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আদিমযুগে ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ। তারপর এলো দাস সমাজ। তা পরিবর্তিত হয়ে এলো রাজতন্ত্র। আজ পৃথিবীতে রাজতন্ত্র নিঃশেষিত হয়ে এসেছে ধনতন্ত্র। আমাদের দেশে টাটা-বিড়লা-আম্বানিদের মতো পুঁজিপতিদের শাসন চলছে। এখানে পুঁজিপতিরাই জমি, খনি, বাগিচার মালিক হয়ে বসেছে। পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাদেরই কুক্ষিগত। কায়িক ও বৌদ্ধিক সমস্ত শ্রমজীবীরাই তাদের গোলাম।

সামন্তী ব্যবস্থা ভেঙে জন্ম নেওয়া বুর্জোয়া ব্যবস্থা পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে। লেনিন বলেছেন, বুর্জোয়া নেতৃত্বে আজ আর সমাজের বিকাশ সম্ভব নয়। আজ সর্বহারা বিপ্লবই সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে। আর্থিক মন্দা থেকে পুঁজিবাদ আমাদের মুক্তি দিতে পারে না। আজ খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য প্রভৃতির সুযোগ জনগণের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। মহামন্দা, শেয়ার বাজারে ধস, কলকারখানা বন্ধ হওয়া প্রভৃতি কোটি কোটি ডলার খরচ করেও রোধ করা যাচ্ছে না। সারা দুনিয়ায় খরবদারি চালায় যে আমেরিকা, সে-ই আজ আর্থিক সংকটের ধাক্কায় জেরবার। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত মালিকানাই পুঁজিবাদী সংকটের মূল কারণ। শিল্পপতিরা ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করে, সামাজিক উদ্দেশ্যে নয়। বাজারে প্রয়োজনীয় জিনিস আছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নেই। বিক্রি না হওয়ায় উৎপাদন কম করা হচ্ছে। কম উৎপাদনের কারণে শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। অভাবের তাড়নায় কৃষকরা জমি বিক্রি করে খেতমজুরে পরিণত হচ্ছে। চাষিরা রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে যে ফসল উৎপাদন করছে, তার যথার্থ মূল্য তারা পাচ্ছে না। অথচ ব্যবসায়ীরা তা কম দামে কিনে বহুগুণ দামে বিক্রি করে মুনাফা লুটছে আর অভাবের তাড়নায় কৃষকরা আত্মহত্যা করছে।

পাটনার সভায় বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আইয়ের কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড রণজিৎ ধর

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এর হাত থেকে মুক্তির উপায় নেই। সমাজতন্ত্রে এই সমস্যা আসে না। পুঁজিবাদে উৎপাদনের সমস্ত লাভ ব্যক্তিমালিক আত্মসাৎ করে, সমাজতন্ত্রে মালিকানা হয় সামাজিক। সেই জন্যই ১৯২৯ সালে দুনিয়াজোড়া মন্দার সময়েও সোভিয়েট রাশিয়ায় উৎপাদন ক্রমাগত বেড়েছে। সমাজতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। তার ফলে চাহিদাও বাড়ে, সাথে সাথে উৎপাদনও বাড়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শোষণের কারণে মানুষের আয় কমে। ফলে চাহিদা কমে, মালিকরা উৎপাদন কমায়। উৎপাদন হ্রাসের জন্যই শিল্পে এবং বাজারে সংকট সৃষ্টি হয়। এর হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা দলের কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, আমরা বিপ্লব নিয়ে ভাবি, এটা বিপ্লবী চেতনা নয়। সর্বহারাশ্রেণীকে নিয়ে ভাবি — এটাও সর্বহারা শ্রেণীচেতনা নয়। সঠিক সর্বহারা শ্রেণীচেতনা হল সর্বহারা পার্টিচেতনা। সর্বহারাশ্রেণীর পার্টি ছাড়া সর্বহারা বিপ্লব হতে পারে না। রাশিয়াতে লেনিনের নেতৃত্বে সঠিক সর্বহারাশ্রেণীর পার্টি বলশেভিক পার্টি ছিল বলেই ১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল। এদেশে সর্বহারাশ্রেণীর পার্টি এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করা এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে গণ আন্দোলন সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মনে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বীজ বপন করা বিপ্লবী কর্মীদের অবশ্যকর্তব্য।

আদিবাসী জনগণের ন্যায্য আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান

একের পাতার পর

সরল গরিব মানুষগুলির মুরগি, ছাগল সহ যথাসর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার নির্মম ঘটনা এখানে ঘটেছে নিত্যদিন। গত ৬/৭ বছর ধরে শাসকদলের মদতপুষ্ট ঐ চক্র যে কোনও ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক প্রতিবাদকে 'মাওবাদী' তকমা লাগিয়ে অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। পেটের জ্বালা নিবারণ করতে অখাদ্য শেকড়বাকড়, পোকামাকড় খেয়ে প্রায় নির্জীব প্রাণীর মতো প্রাণটুকু ধরে রাখা ছাড়া এখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষের কোনও সম্বলও নেই। এই অসহনীয় পরিস্থিতিতে শাসকদল ও তার প্রশ্রয়পুষ্ট ক্রিমিনাল শক্তির বিরুদ্ধে সামান্য মাথা তুললেই নামিয়ে আনা হচ্ছে অকথ্য জুলুম। গত কয়েক বছরে ঘটে যাওয়া শত শত ঘটনার দুয়েকটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। (ক) উৎসবের প্রথা অনুযায়ী শাল গাছের ছোট ডাল সংগ্রহ করতে জঙ্গলে যাওয়া আদিবাসী জনতার উপর জামবনিতে প্রশাসন গুলি চালানোয় গ্রামীণ গৃহবধূ নিহত হন। শাসকদল নির্বিকার। (খ) বেলপাহাড়ির কাছে কালিয়ামের পাথর খাদানের গ্রানাইট পাথর থেকে ঠিকাদাররা কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে, কিন্তু এই পাথর ফাটানোর শক্তিশালী ডিনামাইটের বিস্ফোরণে ধসে পড়েছে চারপাশের কয়েকটি গ্রামের বহু ঘরবাড়ি। ক্ষতিপূরণ তো দূরের কথা, সে দাবি তোলার অপরাধেই শাসকদলের মদতে ঠিকাদার মাফিয়া ও পুলিশচক্র চরম লাঞ্ছনা নির্যাতন চালিয়েছে। (গ) পাথর ভাঙার কাজে গিয়ে অতি সামান্য মজুরির শ্রমিকদের ফুসফুসে সিলিকোসিস নামক রোগ দেখা দিয়েছে, যার ফলে নিদারুণ যন্ত্রণায় মৃত্যু হয়েছে অসংখ্য শ্রমিকের। বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে ঠেকানো যেত এই রোগ — কিন্তু নিঃস্ব সস্তা মজুরদের জন্য সে ব্যবস্থা করেনি কোটিপতি ঠিকাদাররা। বরং মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ, কর্মরতদের নিরাপত্তা আর ন্যায্য মজুরি ও চিকিৎসার দাবি তোলার অপরাধে চরম হুমকি ও ধারাবাহিক মানসিক নির্যাতনের বলি হতে হয়েছে প্রয়াত শিক্ষক ও বিজ্ঞান আন্দোলনের সংগঠক বিজয় ষড়ঙ্গীকে। (ঘ) গোয়ালতোড় থানার কাদশোল গ্রামের গ্রামীণ চিকিৎসক বৃহস্পতি দেবসিংহকে জনস্বাস্থ্য আন্দোলন সংগঠিত করার অপরাধে 'মাওবাদী' ছাপ দিয়ে থানায় তুলে বার বার চূড়ান্ত হেনস্থা করা হয় ২০০৪ সালে। ২০০৬ সালে শালবনির ভাউদি গ্রামের এস ইউ সি আই এবং ছাত্র সংগঠন ডি এস ও'র কর্মী বিশ্বনাথ হাতিকে সিপিএমের প্ররোচনায় 'মাওবাদী' নাম দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়, তার বিরুদ্ধে পার্টি টানা দু'মাস ধরে আন্দোলন চালায়। এ ধরনের ঘটনা হাজার হাজার ঘটছে এবং শাসক দলকে লুঠে খাওয়ার, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ করার সুযোগ করে দিতে প্রশাসন এই জঙ্গলমহলে শতাধিক পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে ১০ বছর ধরে যখন তখন গ্রেপ্তার করেছে, জামিন অযোগ্য ধারায় মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়েছে। এই সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভ তুষের আগুনের মতো জ্বলছে মানুষের মনে। এসব কথা 'সভ্যসমাজের মিডিয়া'য় স্থান পাওয়ার যোগ্য হয়নি। কার কাছে এই নির্মম অবিচারের জন্য তারা কাঁদবে, প্রতিকার চাইবে?

অবস্থাটা এমনই ছিল, কিন্তু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম তাঁদের বিবেকে শহীদ সিধু-কানহু-বিরসার স্মৃতিকে জাগিয়ে দিয়েছে আবার। পুলিশনির্ভর নেতাদের পশুশক্তির কাছে তাঁরা আর নতশির হতে পারছেন না। দাম্ভিক, দুর্নীতিগ্রস্ত, জনবিচ্ছিন্ন, ক্রিমিনাল ও পুলিশ লালগড়ে রাত ১টা থেকে সশস্ত্রভাবে গ্রামের পর গ্রামে স্কুলছাত্র থেকে শিক্ষক, নারী, বৃদ্ধ নির্বিশেষে এমন নির্মম অত্যাচার চালায় যে, ৮ মাসের গর্ভবতী লক্ষ্মী প্রতিহারের পেটে লাথি মেরে অজ্ঞান করে দেয়, গৃহবধূ চিতামণি মুর্মুর চোখে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে অন্ধ করে দেয়।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকে নিপীড়িত জনগণ শিক্ষা নিলেও, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে শোষক ধনকুবেরদের স্বার্থরক্ষায় ও তোষণে অভ্যস্ত দাম্ভিক নেতারা শিক্ষা নেয়নি। তারা 'রাজনৈতিক সমাধান' এর নামে এখন বাংলার ব্যাপক জনগণকে আদিবাসী- বিদ্বেষী উস্কানি ও হুমকি দিচ্ছে এবং সশস্ত্র পুলিশ সহযোগে দলীয় ক্রিমিন্যাল বাহিনীর যৌথ ফ্যাসিস্ট হামলার পরিকল্পনা নিচ্ছে। জনসাধারণের মনে এমন প্রশ্নও উঠেছে, সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে যে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের প্রেরণা পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ায় তাদের সংগঠন রক্ষার জন্য সিপিএম রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাস সৃষ্টির স্বার্থে মাইন বিস্ফোরণের সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে। আরও অনেক সন্দেহ জনমনে ছড়িয়ে পড়েছে। এসবের নিরসন করতে যোগ্য তদন্ত হওয়াও জরুরি। তবে যে ভাবে সারা বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ সন্ত্রাস কবলিত অল্পশিক্ষিত গরিব মানুষের এই প্রতিরোধ সংগ্রামে সমর্থন জানিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য। বোঝা যায়, ৩২ বছর ধরে মার্কসবাদবিরোধী পুঁজিবাদ তোষণকারী ও শোষিতশ্রেণী বিরোধী এবং বিশেষ করে আন্দোলন বিরোধী নীতি ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সিপিএম নেতারা বাংলার বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম, শরৎচন্দ্র, নজরুল, দেশবন্ধু, নেতাজি থেকে শুরু করে তেভাগা বা খাদ্য আন্দোলনের গৌরবময় ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে পারেনি। আমরা মনে করি, দলমত নির্বিশেষে আদিবাসী সমাজ সহ ঝাড়গ্রাম মহকুমা, গোয়ালতোড়, শালবনি এলাকার সর্বধর্মবর্ণের মানুষের এই প্রতিরোধ সংগ্রাম কোনও বিশেষ দলের নয়। ব্যাপক জনগণের ক্ষোভের বিষয় ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ জনিত পুলিশি অত্যাচার হলেও সমস্যাগুলি দীর্ঘদিনের। তাই দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান পাওয়া যেতে পারে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক আন্দোলন আমাদের দল এস ইউ সি আই-তৃণমূল কংগ্রেস গড়ে তুললেও লালগড়ের এই আন্দোলন কোনও দল উদ্যোগ নিয়ে শুরু করেনি, জনগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু করেছেন, দুর্বল নেতাদের একাংশ চাপে পড়ে আপস করতে চাইলেও জনগণ নিজেরাই কমিটি গড়ে সিপিএম প্রশাসনের ও ভীরু নেতাদের চাপিয়ে দেওয়া চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এটাও লক্ষণীয়, এই লড়াইয়ে শুধু আদিবাসীরাই নন, মাহাতো ও অন্যান্য গরিব মানুষ এবং সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন চালাচ্ছেন। শুধু যুবকরাই নন, বিপুল সংখ্যক মহিলারা লড়াইয়ের প্রথম সারিতে আছেন। বেশ কিছু দিন আগে শহরে আন্দোলন হত, অসহায় গ্রামের মানুষ পড়ে পড়ে মার খেত, অদৃষ্টকে দায়ী করত। কিন্তু আজ চিত্র ভিন্ন। গ্রামাঞ্চলেই গণআন্দোলনের আগুন জ্বলছে! শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে, ভারতবর্ষের নানা রাজ্যে শত শত সংগ্রামী সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম গড়ে উঠছে। এই আন্দোলনের আগুন নেভাবার সাধ্য কারও নেই। মাঝে মাঝে স্তিমিত হলেও, আবারও জ্বলে উঠে তা ছড়িয়ে পড়বে পুঁজিবাদী শোষণের অবসান না হওয়া পর্যন্ত। এই লড়াই শুধু সরকারি দল সিপিএমের বিরুদ্ধেই নয়, সমগ্র পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে। কাল ভোটে সিপিএমের জায়গায় যদি কংগ্রেস আসে একই অত্যাচার জুলুম চলবে, যেমন এক সময় এ রাজ্যে হয়েছে, এখন কংগ্রেস ও বিজেপি শাসিত অন্য রাজ্যগুলিতে চলছে। সেজন্য জনগণের ঐক্যবদ্ধ কমিটি গঠন করে প্রত্যেক গ্রামে তার শাখা এবং যুবসম্প্রদায় ও নারী সমাজের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা একান্ত জরুরি। নির্বাচনসর্বস্ব দলের বা যে কোনও আন্দোলনকে ভিত্তি করে যারা নির্বাচনী সুযোগ নিতে চায়, তাদের সাহায্য নিতে হলেও সতর্ক থাকতে হবে। কারণ তারা ভোটের স্বার্থে আপসের পথে বা হঠকারিতার পথে আন্দোলনের ক্ষতি করতে পারে। কোনও দলকে অন্ধভাবে সমর্থন করা মারাত্মক ক্ষতিকারক হবে, এমনকী আমাদের মহান নেতা শিবদাস ঘোষের শিক্ষা নিয়ে আমরা বলি, এস ইউ সি আই দলের কথাও অন্ধভাবে মানা উচিত নয়। যে কোনও দল বা নেতার কথাই যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ বা বর্জন করা উচিত। সেজন্য নেতা-নির্ভর বা দল-নির্ভর মনোভাব বদলে জনগণের নিজস্ব বিচার ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থাকে সমূলে উচ্ছেদের বিপ্লব ছাড়া আজকের সমাজের কোনও বঞ্চনা-অবিচার-অত্যাচারের সার্বিক সমাধান হবে না। তাই যে কোনও আন্দোলনকে সুসংগঠিত ও উন্নত চেতনার ভিত্তিতে গড়ে তুলে তাকে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক করতে হবে। মার্কসবাদের পথনির্দেশ ও বিশেষ প্রয়োগ ছাড়া পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা অসম্ভব এবং সে ক্ষেত্রে শোষণমুক্তির বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক দর্শন মার্কসবাদের উপরই নির্ভর করতে হবে। সিপিএমকে দেখে মার্কসবাদ বর্জন করা হবে ঠগ ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানকেই বর্জন করার মতো বোকামি।

স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস ও বিজেপি যখন যেখানে সরকারে এসেছে আদিবাসী সহ গরিব মানুষদের উপর শোষণ, লাঞ্ছনা কেন বাড়তে দিয়েছে, কেন বিজেপি নির্ভর সরকার ওড়িশায় টাটার স্বার্থে ১২ জন আদিবাসীকে গুলিতে হত্যা করে জমি দখল করল এবং এই দুই দলই লালগড়ের প্রতিরোধ সংগ্রাম প্রত্যাহার করার আবেদন করে জনগণকে ফ্যাসিবাদী অত্যাচারের মুখে ঠেলে দিতে চাইছে — তার জবাব দিতে হবে।

আমাদের দল সর্বশক্তি দিয়ে এই আন্দোলনকে সহায়তা করে জয়ের লক্ষ্যে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এলাকার প্রবীণ চিন্তাশীল নিঃস্বার্থ মানুষদের কাছে আবেদন, সর্বত্র সাহসী তেজি যুক্তিবাদী সৎ যুবক-যুবতীদের এবং মহিলাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে সংগঠিত করুন। বীর শহীদ সিধু, কানহু, বিরসা, শিরোমণি, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতাদের নামে শপথ নিয়ে তাঁদের চরিত্র থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের এগিয়ে দিন। সংবাদপত্রে লালগড়ের কিছু মানুষের যতটুকু বুকের বেদনা প্রকাশিত হয়েছে, যেমন ''শ্রীদাম শবর বলেন, 'এতো শুধু সাঁওতালদের লড়াই নয়। নিপীড়িত সব মানুষদের লড়াই' ... ডগমণি টুডু, পানমণি টুডু, ছোটমণি সোরেনদের বক্তব্য, 'আমাদের তো এতকাল কেউ মানুষ বলেই মনে করেনি। যুগ যুগ ধরে কষ্ট পেয়েছি। সম্মানের জন্য না হয় আর একটু কষ্ট করি।'' এই সব বক্তব্যকে আমরা গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানাই। গরিবদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে, লোভ ও ভয় দেখিয়ে গরিবের শত্রুরা গরিবদের বশ মানাতে চাইবে — এ বিষয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব সতর্ক হোন, উন্নত মর্যাদাবোধ নিয়ে দাবি আদায় পর্যন্ত সংগ্রামের শপথ নিন। সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আহ্বান, লালগড়সহ জঙ্গলমহলের নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামের পাশে দাঁড়ান।

কেরালায় 'সেজ'বিরোধী শ্রমিক মিছিল

কেরালায় সিপিএম পরিচালিত এল ডি এফ সরকার দশটিরও বেশি স্পেশাল ইকনমিক জোন (সেজ) তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই প্রতিবাদে ১৮ নভেম্বর অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি তিরুবন্তপুরমে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেয়। মিছিল শুরুর আগে সমবেত শ্রমিকদের সামনে প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড কে পি কোশালা বলেন, স্পেশাল ইকনমিক জোন আসলে দেশের মধ্যে একটা দেশ যেখানে শ্রম আইনের কোনও বালাই নেই। জনগণের সম্পত্তি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার এবং শ্রমিকদের দাসে পরিণত করার এ এক বিশেষ ক্ষেত্র। এস ইউ সি আই কেরালা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সি কে লুকোস বলেন, সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে বাঁচানোর লক্ষে যে বিশ্বায়নের সূচনা, স্পেশাল ইকনমিক জোন তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পুঁজিবাদের আয়ুষ্কাল বাড়াতে সিপিএম সরকারের এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন তিনি। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহসভাপতি কমরেড ডি সুন্দরশন, সম্পাদক কমরেড ভি কে সদানন্দন, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস্ পি এম দীনেশন, এস রাধাকৃষ্ণন, এস সিথিলাল প্রমুখ। মিছিলে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ কে এস বিজয়ন, আব্দুল আজিজ, কে পি বিজয়ন, বি ইমামুদ্দিন পি আর সাথিশন, এম এ বিন্দু, কে হরি।

তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের নীল নক্সা

চারের পাতার পর

১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত দেশের কৃষিতে এগিয়ে থাকা এলাকায় আত্মহত্যাকারী কৃষকের সংখ্যা ১,৩৪,৩৪১ জন। বর্তমানে এই সংখ্যা বাড়ছে আরও দ্রুত গতিতে। পশ্চিমবঙ্গেও আলুচাষিদের আত্মহত্যার সংখ্যা প্রতি বছর বাড়ছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর ওয়াই ভি রেড্ডিকে আমেরিকার পিটারসন ইনস্টিটিউটে ভাষণ দিতে গিয়ে স্বীকার করতে হয়েছে, ''যেসব রাজ্যে কৃষকদের ব্যাংক ঋণ বেশি দেওয়া হয়, সেই সব রাজ্যেই কৃষকদের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা বাড়ছে।''

শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে শিল্পপণ্যের মতো কৃষিপণ্যেরও উৎপাদন বাড়ানোর যত রকম কৌশলই নেওয়া হোক না কেন তা যে বৃহৎ পুঁজিপতিদেরই আরও বেশি পুষ্ট করবে উপরোক্ত ঘটনাগুলি সে কথাই আর একবার প্রমাণ করছে। আজকের এই 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব'-এর নানা কৃৎকৌশল পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদেরই মস্তিষ্কপ্রসূত এবং তা সাধারণ কৃষকদের শোষণের জালে আরও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে। তাই, দেশের কৃষক সমাজের কাছে এই সর্বনাশা পরিকল্পনার বিপদ তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন আমাদের গড়ে তুলতে হবে।

সুদানের ছাত্র সম্মেলনে আমন্ত্রিত এ আই ডি এস ও

১১-১২ নভেম্বর সুদানের রাজধানী খার্তুমে অনুষ্ঠিত হল জেনারেল সুদানিজ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (জি এস এস ইউ)-এর দ্বাদশ সাধারণ সম্মেলন। এই ছাত্র সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া, পাকিস্তান থেকে ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দেন। ভারত থেকে একমাত্র এ আই ডি এস ও-ই আমন্ত্রিত হয়েছিল।

জি এস এস ইউ সুদানের ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত একটি ছাত্র সংস্থা। এটি সরকারস্বীকৃত। দেশের ২২টি প্রদেশ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং নাইজিরিয়া, পাকিস্তান, ইয়েমেন, ইউনাইটেড আরব এমিরেটস, লেবানন ও অন্যান্য দেশে পাঠরত সুদানি ছাত্ররা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সুদানে কমরেড সৌরভ মুখার্জী (ডানদিক থেকে দ্বিতীয়) এবং অন্যান্য ছাত্রনেতৃবৃন্দ

প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১১ নভেম্বর খার্তুমের জামা স্ট্রিটে ফ্রেন্ডশিপ হলে। প্রধান অতিথি ছিলেন সুদানের রাষ্ট্রপতি মহঃ ওমর হাসান আহমেদ আল বশির। ১২ নভেম্বর প্রতিনিধি অধিবেশনের শেষে ইরাক, পাকিস্তান, তুরস্ক এবং ভারতের প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা জানানো হয়। জি এস এস ইউ প্রদত্ত সংবর্ধনার উত্তরে কমরেড সৌরভ মুখার্জী এ আই ডি এস ও-র পক্ষ থেকে স্মারক উপহার দেন। এরপর তিনি পুঁজিবাদের বর্তমান তীব্র সংকটের পটভূমিকায় দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের আক্রমণের সর্বশেষ পরিকল্পনা, তথাকথিত বিশ্বায়নের আঘাত, গ্যাটস এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এগুলির কুপ্রভাব, শিক্ষার বেসরকারীকরণ-ব্যবসায়ীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের উল্লেখ করে তিনি দেখান, আজকের যুগে বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা মানুষকে, বিশেষ করে ছাত্রসমাজকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে চলেছে।

ভাষণের শেষে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের নির্বাচিত রচনাবলীসহ বেশ কিছু বই জি এস এস ইউ-এর সভাপতির হাতে তুলে দেন এই আশায় যে, এই শক্তিশালী হাতিয়ার সুদানের ছাত্র আন্দোলনকেও সাহায্য করবে। জি এস এস ইউ-এর কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের হাতে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষ ও কমরেড নীহার মুখার্জীর রচনা এবং এ আই ডি এস ও-র পত্র-পত্রিকা তুলে দেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ঐ বইগুলি নেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু বইয়ের সংখ্যা কম থাকায় সকলকে তা দেওয়া যায়নি।

১৩ নভেম্বর এক সভায় বিভিন্ন দেশের ছাত্রনেতাদের মধ্যে আলোচনার পর ১৫ নভেম্বর জি এস এস ইউ সভাপতি মহঃ কাজে বাবকার এবং কমরেড সৌরভ মুখার্জীর মধ্যে আলোচনা হয় খার্তুমের জি এস এস ইউ অফিসে। সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল, উভয় সংগঠনের পারস্পরিক সহযোগিতা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উস্কানিতে আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল কোর্ট কর্তৃক সুদান সরকারের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপের নিন্দা করার জন্য জি এস এস ইউ সভাপতি এ আই ডি এস ও-কে অনুরোধ করেন।

অন্ধ্রপ্রদেশ

মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে সভা

'এটা বাস্তব সত্য যে, ১৯২৯ সালের মহামন্দার ঢেউ সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া তোলপাড় করলেও পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় তার আঁচ পড়েনি শুধু নয়, সেই সময়ে সে দেশে সমস্ত ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছিল। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ছিল দারিদ্র, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি প্রভৃতি থেকে মুক্ত। পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি দেশের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য ছিল' — ১৬ নভেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরে এন জি ও হলে মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় এ কথা বলেন এস ইউ সি আই অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে শ্রীধর। তিনি বলেন, বিভিন্ন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো, বিশেষ করে আমেরিকা, শ্রমজীবী জনগণকে নিংড়ে নিয়ে উদ্বৃত্ত পুঁজি অনিয়ন্ত্রিতভাবে ফাটকাবাজারে খাটাচ্ছে যার পরিণামে এই সংকট। তিনি আরও বলেন পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই এই সংকট থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ।

এ দিনের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড জি ললিতা, বক্তব্য রাখেন অনন্তপুর জেলা সম্পাদক কমরেড বি এস অমরনাথ। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

১৫-১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্ট গণদাবীর গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে সংগঠনের নবনির্বাচিত রাজ্য কমিটির তালিকা প্রকাশিত হল।

অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নবনির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

সভাপতি ঃ	কমরেড সেখ খোদা বক্স
সহসভাপতি ঃ	কমরেড শঙ্কর ঘোষ
	কমরেড মদন সরকার
সম্পাদক ঃ	কমরেড পঞ্চানন প্রধান
সম্পাদকমণ্ডলী ঃ	কমরেড জাকিমউদ্দিন সেখ
	কমরেড মদন ঘটক
	কমরেড মনোরঞ্জন পণ্ডিত
	কমরেড রুহুল আমিন
	কমরেড নন্দ পাত্র
কোষাধ্যক্ষ ঃ	কমরেড গোপাল বিশ্বাস

রাজ্য কমিটির সদস্য

কমরেড দাউদ গাজী -	উঃ২৪ পরগণা	কমরেড উত্তম হালদার -	দক্ষিণ ২৪ পরগণা
কমরেড ধনঞ্জয় ঘোষ -	মুর্শিদাবাদ	কমরেড মানিক কপাট -	,,
কমরেড ফকির মহম্মদ -	,,	কমরেড হরিভক্ত সরকার -	জলপাইগুড়ি
কমরেড গোলাম মেহবুব বিশ্বাস	,,	কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মন -	কোচবিহার
কমরেড আব্দুল ফজল -	,,	কমরেড নৃপেন কার্য্যি -	,,
কমরেড সীতারাম মাহাতো-	পুরুলিয়া	কমরেড আছিরুদ্দিন আহমেদ -	,,
কমরেড শ্যামাপদ পরামানিক -	,,	কমরেড আবুল কাসেম -	দার্জিলিং
কমরেড দিলীপ কুণ্ডু -	বাঁকুড়া	কমরেড নুর ইসলাম -	দক্ষিণ দিনাজপুর
কমরেড দোনা গোস্বামী -	বর্ধমান	কমরেড মোক্তার আহমেদ -	উত্তর দিনাজপুর
কমরেড সুব্রত বিশ্বাস -	,,	কমরেড সূর্য প্রধান -	মেদিনীপুর
কমরেড বাগাল মান্ডি -	বীরভূম	কমরেড প্রভঞ্জন জানা -	,,
কমরেড রেণুপদ হালদার -	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	কমরেড স্বদেশ পড়া -	,,
কমরেড ইয়াহিয়া আখন্দ -	,,	কমরেড মন্মথ দাস -	,,

পৃথক ঝাড়খন্ড রাজ্য গঠন করে জনগণের সমস্যা মেটেনি

বিরসা মুণ্ডা স্মরণ অনুষ্ঠানে বললেন বক্তারা

জামশেদপুরের শ্রীকৃষ্ণ মেমোরিয়াল হলে বিরসা মুন্ডা জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ১৫ নভেম্বর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'বিরসা মুন্ডার স্বপ্ন, সংগ্রাম ও বর্তমান ঝাড়খণ্ড' শীর্ষক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঘাটশিলা কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড. মিত্রেশ্বর, স্থানীয় এল বি এস এম কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ড. দিগম্বর হাঁসদা, সাঁওতালি লেখক ও ভাষাবিদ ভোগলা সোরেন, সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক নন্দকুমার উম্মন। সভা পরিচালনা করেন সুমিত রায়।

আলোচনা সভায় বক্তারা বিরসা মুন্ডার জীবনের বহু সংগ্রামের দিক তুলে ধরেন। ঝাড়খণ্ডের বর্তমান দুর্দশার দিক তুলে ধরে তাঁরা বলেন, যে স্বপ্ন নিয়ে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হয়েছিল আজ তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। আদিবাসীদের পরিস্থিতি দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে। আজ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিশ্বায়ন, তথা নয়া আর্থিক নীতির ফলে শোষণ, অত্যাচার বেড়েই চলেছে। ঝাড়খণ্ডেও এর প্রভাব পড়ছে। জল, জঙ্গল, জমি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। এর জন্য দায়ী হচ্ছে পুঁজিবাদ - সাম্রাজ্যবাদ। তাঁরা বলেন, পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রাম জোরদার করার মধ্য দিয়ে আজ বিরসা মুণ্ডার স্বপ্ন সার্থক করতে হবে। এই পথ বেয়ে ভারতবর্ষে তথা ঝাড়খণ্ডে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে। পরে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন কবি শ্যামল সুমন, অমিত রায়, বেহুলা সরদার, সোহেল আনসারী, বাপী দাস প্রমুখ।

সারের দাবিতে হুগলিতে পথ অবরোধ

সার ব্যবসায়ী ও প্রশাসনের যোগসাজশে সারের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে এবং সরকারি মূল্যে সার সরবরাহের দাবিতে হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া থানা এলাকায় ১০ নভেম্বর ও হরিপাল থানা এলাকায় ১২ নভেম্বর কয়েকশত চাষি পথ অবরোধ করেন। দু'জায়গাতেই দু'ঘণ্টার বেশি পথ অবরোধ চলে। শেষপর্যন্ত পাণ্ডুয়ায় ব্লক কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক এবং হরিপাল থানার ওসি সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ তোলা হয়। আলুচাষি সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন বিশ্বনাথ ঘোষ, উত্তম মণ্ডল, শেখ নাসিরুদ্দিন, নেপাল সাহা প্রমুখ।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

লালগড়ে বুদ্ধিজীবী মঞ্চের প্রতিনিধিরা

শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি বিশিষ্ট কবি অধ্যাপক তরুণ সান্যালের নেতৃত্বে ২৮ জনের এক প্রতিনিধিদল আদিবাসী জনগণের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে ২৬ নভেম্বর লালগড়ে যান। ওখানে আদিবাসী জনগণ ও আন্দোলনের নেতারা বুদ্ধিজীবীদের স্বাগত জানান।

২৬ নভেম্বর সকালে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে প্রতিনিধিদল মেদিনীপুর শহরে পৌঁছলে মেদিনীপুর সুরক্ষা সমিতির প্রেসিডেন্ট জগবন্ধু অধিকারী, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি প্রবীণ ভানুরতন গুঁই ও অন্যান্যরা অভ্যর্থনা জানান। ওখান থেকে লালগড় অভিমুখে শালবনি ব্লকে পেজাপাড়াতেই প্রথম রাস্তা অবরোধের সামনে পড়েন মঞ্চের প্রতিনিধিরা। আদিবাসী যুবকরাই এগিয়ে এসে গাড়িগুলির যাওয়ার রাস্তা করে দেন।

যাওয়ার পথে হঠাৎ দেখা মেলে বাইক মিছিলের। প্রায় ৫০টি মোটরবাইকে ১০০ জনের ওপর আরোহী, অনেকেরই মুখে কাপড় বাঁধা। এরা কারা? পরে জানা গেল, আদিবাসী জনগণের মধ্যে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করতেই দলের পতাকা ছাড়া এই সিপিএম বাহিনী বাইকে করে টহল দিচ্ছে। ফল কী হয়েছে? ভয় পাওয়ার পরিবর্তে জবাব হিসাবে আদিবাসী জনতা অবরোধের সীমানা বাড়িয়ে দিয়েছে। ফিরে আসার পথে দেখা গেল, নতুন নতুন জায়গায় সদ্য কাটা বড় বড় গাছ ফেলে দেওয়া হয়েছে রাস্তার ওপর।

ছোটপেলিয়া গ্রামের শেষপ্রান্ত, যেখান থেকে বড়পেলিয়া গ্রামের শুরু, সেখানে প্রতিনিধিদল পৌঁছলে সাধারণ মানুষ জড়ো হয়ে যান বুদ্ধিজীবীদের ঘিরে। এখানে অধ্যাপক তরুণ সান্যাল বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, যেখানেই মানুষের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন হবে, মানবাধিকার লংঘিত হবে, সেখানেই মানুষের পাশে দাঁড়াতে বুদ্ধিজীবী মঞ্চ অঙ্গীকারবদ্ধ। কীভাবে যুগ যুগ ধরে আদিবাসী জনগণ শোষিত অত্যাচারিত হয়ে এসেছে, তার কিছু কিছু ইতিহাস উল্লেখ করে এবং এর বিরুদ্ধে আদিবাসী বীর জনগণের সংগ্রামকে স্মরণ করে তিনি বলেন, আজ যেভাবে লালগড় সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আদিবাসী জনগণ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, তাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। তিনি বলেন, সরকার রাজ্য পরিচালনা করতে পারছে না। দার্জিলিং আলাদা হতে চাইছে, উত্তরবঙ্গের নানা জেলায় পৃথক হওয়ার দাবি উঠেছে। এখন ঝাড়গ্রাম মহকুমা সহ আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে তেমন দাবি উঠলে দুঃখের বিষয় হবে। এরা কেউই পৃথকতাবাদী নয়, পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক হিসাবে অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষের সাথে এরা দীর্ঘকাল বাস করে আসছে। আলাদা হওয়ার কথা এদের মধ্যে দেখা দেয়নি। আজ যদি দুঃখজনক ভাবে তা ওঠে, তবে বলতেই হবে, পরিবারে ঐক্য রাখতে এই শাসকরা ব্যর্থ। পুলিশ দিয়ে অত্যাচার করে মানুষের মুখ বেশি দিন বন্ধ করে রাখা যায় না। 'জনগণের কমিটি'র অন্যতম নেতা ছত্রধর মাহাতো এখানে তরুণ সান্যাল, পল্লব কীর্তনিয়া, মীরাতুন নাহার, দিলীপ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যদের সাথে মত বিনিময় করেন। ঐ সময়ই আদিবাসী জনগণের একটি মিছিলের প্রস্তুতি চলছিল রামগড়ে তাদের জনসভা উপলক্ষে। মঞ্চের প্রতিনিধিদল এরপর আরও ভিতরে কাঁটাপাহাড়িতে যান। বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক সেখানে অধ্যাপক তরুণ সান্যালের সাথে দেখা করে পুলিশের জুলুম সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানান। এরপর কাঁটাপাহাড়ি যান বুদ্ধিজীবীরা।

২৭ নভেম্বর কলেজ স্কোয়ার

রামগড়মুখী বিরাট মিছিল কাঁটাপাহাড়িতে আসে। এখানেও মহিলারা অগ্রভাগে। সকলেরই চোখেমুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। নেতৃত্বে ছিলেন কমিটির সভাপতি লালমোহন টুডু। তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন তরুণ সান্যাল। বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সদস্য শিক্ষক পরিমল হাঁসদা মিছিলকারীদের মাইকে সাঁওতাল ভাষায় মঞ্চের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন আদিবাসী জনগণকে। মঞ্চের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণ নস্কর বলেন, কোনও রাজনৈতিক দলের মুখাপেক্ষী না থেকে আদিবাসী জনগণ যেভাবে নিজেরাই কমিটি গঠন করে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, তা অভিনন্দনযোগ্য। আপনারা আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রত্যক্ষভাবে পরিস্থিতি দেখতে আসার জন্য। আমরা দেখলাম, আপনাদের দাবিগুলি ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক, সরকারের এগুলি এখনই মেনে নেওয়া উচিত। অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহারও বক্তব্য রাখেন।

ওখান থেকে মঞ্চের প্রতিনিধিদল সোজা চলে আসেন মেদিনীপুরে জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরে। জেলাশাসকও সেখানে আসেন। তাঁদের সাথে আলোচনায় তরুণ সান্যাল বলেন, আদিবাসী জনগণের ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক দাবিগুলি মীমাংসার জন্য প্রশাসন কেন উদ্যোগী হচ্ছে না? প্রশাসনের কর্তারা বলেন, তাঁরা চেষ্টা করলেও আন্দোলনকারীরা সাড়া দিচ্ছে না, দলিলপুরে গিয়ে আলোচনা করতে বলছে। মঞ্চের প্রতিনিধিরা বলেন, আন্দোলনকারীরা যেমন প্রশাসনিক দপ্তরে যায় আলোচনা করতে, তেমন কখনও প্রশাসনকেও যেতে হতে পারে জনগণের মাঝে আলোচনার জন্য, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ডি এম এবং এস পি সহায়তার জন্য বুদ্ধিজীবী মঞ্চকে অনুরোধ করলে বলা হয়, মঞ্চ এ ব্যাপারে সর্বদা সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু প্রশাসনের ওপর জনগণ যদি আস্থা হারিয়ে থাকে, তবে তা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তো প্রশাসনেরই। তাঁরা সেটা আগে করুন। প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন চৈতালী দত্ত, সজল রায়চৌধুরী, তপন রায়চৌধুরী, ডাঃ তরুণ মণ্ডল, সান্টু গুপ্ত, অজন্তা ঘোষ, অনামিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রুবি মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চ্যাটার্জী প্রমুখ।

দাবি আদায়ে বদ্ধপরিকর পিটিটিআই ছাত্ররা

রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার ফলে রাজ্যের প্রায় ৭৫ হাজার কর্মরত শিক্ষক, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষণরত ছাত্রছাত্রী কী ঘোর সংকটে পড়েছেন, তা রাজ্যবাসীর অজানা নেই। এন সি টি ই-র কোনওরকম অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে অনুমোদন দিয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্ট সম্প্রতি এগুলিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করায় ছাত্রছাত্রীরা কার্যত অথৈ জলে পড়ে যান। ছাত্রছাত্রীরা রাজ্য সরকারের এই দায়িত্বজ্ঞানহীন ভূমিকার বিরুদ্ধে তাই বাঁচার জন্য গড়ে তোলেন আন্দোলনের হাতিয়ার পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সমিতি। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২৯ নভেম্বর এসপ্ল্যানেড মেট্রো চ্যানেলে সমিতির পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে এস ইউ সি আই, এ আই ডি এস ও, বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ প্রভৃতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী, অধ্যাপক তরুণ নস্কর, তৃণমূল নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এস ইউ সি আই বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার, অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, এ আই ডি এস ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রাজকুমার বসাক, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রাজ্য সভাপতি বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক শিক্ষণ সমিতির যুগ্ম সম্পাদক অশোক রুদ্র ও প্রবীর কুমার ঘোষ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভা পরিচালনা করেন সমিতির সভাপতি আনন্দবরণ হাণ্ডা। সমিতি ঘোষণা করেছে, ১৫ দিনের মধ্যে পিটিটিআই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হলে তাঁরা লাগাতার মহাকরণ ঘেরাও করবেন।

সমিতির বীরভূম জেলা কমিটির ডাকে ১২ নভেম্বর সিউড়িতে এডিএম-কে ডেপুটেশন এবং ১৯ নভেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ অফিসে বিক্ষোভ ও সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে পথ অবরোধ করা হয়। পুলিশ লাঠিচার্জ করে জেলা সভাপতি সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে।

পেট্রোপণ্যের দাম কমানোর দাবিতে বহরমপুরে অবরোধ

২৪ নভেম্বর বহরমপুর গির্জার মোড়

রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই প্রার্থী কমরেড সুভাষ চন্দ্র ঝুনঝুনু জেলার পিলানি কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণে ৬-এর পাতার দ্বিতীয় কলামে ভুলক্রমে ''সমাজের স্বার্থ গৌণ'' ছাপা হয়েছে। হবে 'সমাজের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ'। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার রুটিন

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত বৃত্তি পরীক্ষা ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ থেকে শুরু হবে। চলবে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ফর্ম জমা দেবার শেষ তারিখ ১৩ ডিসেম্বর। বৃত্তি পরীক্ষার রুটিন নিম্নরূপ ঃ

০৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ - মাতৃভাষা-সাহিত্য
১০ ফেব্রুয়ারি " - গণিত
১১ ফেব্রুয়ারি " - ইতিহাস -ভূগোল
১২ ফেব্রুয়ারি " - বিজ্ঞান
১৩ ফেব্রুয়ারি " - ইংরেজি

পরদিন ২৭ নভেম্বর কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বুদ্ধিজীবী মঞ্চের ডাকে অনুষ্ঠিত সভায় তরুণ সান্যাল, দিলীপ চক্রবর্তী, মীরাতুন নাহার, সজল রায়চৌধুরী, তরুণ নস্কর, বিশ্বম্ভর মুড়া লালগড় সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সভাপতিত্ব করেন বিভাস চক্রবর্তী। সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত প্রস্তাবে — লালগড় সহ পশ্চিমবঙ্গে যে পুলিশি অত্যাচার চলছে, তার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানানো হয় এবং আশা করা হয়, অবিলম্বে আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধানের পথে সরকার যাবে।

মুম্বইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহতদের স্মরণে সভায় এক মিনিট নীরবতা পালন করে শোক প্রকাশ করা হয়। একটি প্রস্তাবে 'যে কোনও ধরনের, যে কোনও বর্ণের, যে কোনও রঙের' সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করা হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in